সিকিম

ভারত—দেশ ও দেশবাসী

সিকিম

ড. অপর্ণা ভট্টাচার্য

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

আলোকচিত্র সৌজন্য :
পর্যটন বিভাগ, সিকিম সরকার
সী. তেন. তাসী, গ্যাংটক
শ্রী চুল-তেন লেপচা, গ্যাংটক
শ্রীপিল্লে, গ্যাংটক

প্রথম প্রকাশ : 1989 (শক 1911)

মূল্য : 24.00 টাকা
SIKKIM *(Bengali)*
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ

বাবাকে—

বইটা আজ হাতে তুলে দিতে পারলে
যাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হাসিতে ঝকঝক করত

সূচিপত্র

ভূমিকা

হিমালয়ের বিশালতা, শালবনের উদারতা ও চা-বাগিচার সৌরভ দিয়ে ঘেরা দার্জিলিং জেলার এক মফঃস্বল শহরে আমার জন্ম। ছোটবেলা থেকেই পার্বত্য জাতিদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ও নিবিড় আত্মীয়তা। শীতকালে সিকিম, ভূটান, দার্জিলিং এইসব পাহাড় অঞ্চলের মানুষরা নেমে আসতো আমাদের শহরে। গাছের তলায়, স্টেশনের ধারে অথবা কোন বাড়ীর খালি বারান্দায় অস্থায়ী সংসার পেতে তারা কাটিয়ে যেত তীব্র শীতের কয়েকটা মাস। খোলা মাঠে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে ওদের ঘুমিয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে ভরে উঠতো শৈশবের নরম মন। একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—'ওদের শীত করে না?' বাবা দূরে কাঞ্চণজজ্ঘার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন,—'ওরা যে ঐ বরফের দেশের লোক, তাই এখানে ওদের শীত করে না।' গায়ে আলখাল্লার মত পোষাক, মাথার উপরে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা লম্বা বেনী গোল করে ঘোরানো, পায়ে মোটা কাপড়ের বুট জুতো পরা ভুটিয়ারা আসতো ; মেরুন রঙের 'ছুবা' গায়ে, মাথায় কান ঢাকা লোমের টুপি পরা লামারাও আসতো, ডুম ডুম করে ডমরু ধরণের বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে চাইতো দরজায় দাঁড়িয়ে আর গিন্ গিন্ নাকি শব্দে অনর্গল কী বকে যেত। আমরা সেই সুর অনুকরণ করে ব্যঙ্গ করতাম। দুর্বোধ্য ভাষার দূরত্ব দূর হয়ে যেত মুখের শুভ্র সরল হাসিতে। বড় হয়ে জেনেছিলাম ওরা বৌদ্ধধর্মের মন্ত্র অর্থাৎ তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ 'তাঞ্জুর' ও 'কাঞ্জুর' থেকে আবৃত্তি করে।

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পর্কে আমার মাতামহ ছিলেন। পালি ভাষা, বৌদ্ধ দর্শন ও ভোট বিজ্ঞানে তাঁর উত্তরাধিকার লাভ করার যোগ্যতা আমার নেই। তবু এই পার্বত্য জাতিদের সম্বন্ধে জানার এক গোপন আগ্রহ বরাবর মনের মধ্যে ছিল। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় বিশেষ ভাষা শিক্ষার ক্লাসে তিব্বতী ভাষা শিখতেও শুরু করেছিলাম,—সম্পূর্ণ করতে পারি নি। তাই ছেলেবেলার সেই স্বপ্নমাখা কাঞ্চনজজ্ঘার দেশে এসে যখন বাস করার সুযোগ হল, তখন এদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আবার প্রবল হয়ে উঠলো। আর গ্যাংটকের টিবেটোলজি তার

বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে যেন দুহাত মেলে ডাকতে লাগলো,—অনেক না পার, কিছুটা অন্তত জেনে যাও।

আমার সেই কিছুটা জানার ফসল এই বই। কিন্তু এবিষয়ে বই লেখার কোন কল্পনা কখনও ছিল না। কিছুদিন আগে আকাশবাণী শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের বিষয়ে একটি কথিকা পাঠ করেছিলাম। সেই কথিকা শুনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, আমারও শিক্ষক, শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় একটা চিঠি লেখেন, এই বিষয়ে একটা বই লেখার চেষ্টা করছি না কেন। সেই থেকেই বই লেখার ধারণার জন্ম।

এই বই-এর অনেকগুলি পরিচ্ছেদ এর আগে কলকাতা থেকে 'হিমালয় প্রসঙ্গ', শান্তিনিকেতন থেকে 'উদীচী', শিলিগুড়ি থেকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের আমলে Charles Bell, Claud White, Waddell, Hooker, Macanlay প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক এবং গবেষকরা সিকিমের উপর বিভিন্ন বই লিখেছেন। ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির পরেও সিকিম সম্বন্ধে ইংরেজীতে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একথা বলা হয়তো অন্যায় বা অত্যুক্তি হবে না যে সে বইগুলি প্রায় প্রত্যেকটিই বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ ও বিশেষ মতবাদ নিয়ে লেখা। সিকিমের সামগ্রিক রূপ তাতে ফুটে ওঠে না। বাংলায় সিকিমের উপর যে দু'একটি বই চোখে পড়েছে তা নিতান্তই ব্যক্তিগত ভ্রমণ কাহিনী। অথচ এই ক্ষুদ্র দেশটার পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে, বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের সমাজ জীবনে, আচার অনুষ্ঠানে, উপাখ্যানে উপকথায় কত যে জানার ও অন্বেষণের রসদ ছড়িয়ে আছে তা একটি মাত্র বইতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার স্বল্প সামর্থ নিয়ে তার আভাস দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

সিকিমের ইতিহাস সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন প্রামাণ্য বই সরকারের তরফ থেকেও প্রকাশিত হয় নি। বিশেষ করে সিকিমের প্রাচীন ইতিহাস জানার একমাত্র উৎস মহারাণী ইয়েশে দোলমার তিব্বতী ভাষায় লেখা ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির ইংরেজী অনুবাদ, যার টাইপ করা কয়েকটি মাত্র কপি সিকিমের প্রাচীন কয়েকজন ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায়। 1894 খ্রীষ্টাব্দে H. H. Rislay-র সম্পাদনায় যে Gazetteer of Sikhim প্রকাশিত হয় তাতেও সিকিমের প্রাচীন ইতিহাস মহারাণী ইয়েশে দোলমার লেখা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেই ইতিহাসটিও সম্পাদনা করে প্রকাশ করার ব্যপারে সরকারী বা বেসরকারী কোন পক্ষ থেকেই কোন উদ্যোগ কখনও নেওয়া হয় নি। তাই এই বই-এ শুধু ঘটনা পরম্পরা অনুসারে

সিকিমের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সামান্য পরিচিতি দেবার প্রয়াস করা হয়েছে। এ ইতিহাস শুধু সংক্ষিপ্তই নয়, অসম্পূর্ণও বটে।

আরও একটি বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখা দরকার,—তিব্বতী উচ্চারণের বাংলা বানান লেখা শুধু যে দুঃসাধ্য তাই নয়, ধ্বনিগত প্রতিবর্ণ লেখাও প্রায় অসম্ভব। এজন্য যে তিব্বতী নাম ও শব্দ এই বইতে ব্যবহৃত হয়েছে তার শুদ্ধতা সম্পর্কে নিজেরই সংশয় রয়ে গেছে।

এই বই লেখার ব্যপারে আমি যাঁর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি তাঁর কাছে শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেই আমার ঋণ শোধ হবে না,—তিনি সিকিমের প্রাক্তন মুখ্য সচিব, রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, শ্রীযুক্ত ইয়াপা-ডি-দাহ্‌ল। ইনি নিজেও "The Hidden Land of Rice" নামে একটি বই লিখেছেন যা প্রকাশের অপেক্ষায়। শ্রীযুক্ত দাহ্‌লের কাছ থেকেই আমি এই বই-এর প্রধান উপকরণ সংগ্রহ করেছি বলা যায়। রায়বাহাদুর টি. ডি. দেন-সাপ্পাকে সিকিমের "চলন্ত অভিধান" বলা হয়, তিনি এখন বৃদ্ধ ও প্রায় অসমর্থ। তবু তাঁর কাছ থেকে, যখনি দরকার হয়েছে, আমি বহু প্রশ্নের উত্তর ও তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ বিষয়ে তাঁর পুত্র, সিকিমের বর্তমান গৃহ-সচিব, শ্রী জিগ-দেল দেন-সাপ্পা ব্যক্তিগতভাবে এবং রায়বাহাদুর ও আমার মধ্যস্থ হিসেবে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি আমাদের বন্ধু বলেই তাঁর কাছে আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানানোর শোভন হয় না। সিকিম রাজ্য পরিষদের প্রাক্তন সদস্য শ্রীযুক্ত কাশীরাজ প্রধান, প্রাক্তন দেওয়ান শ্রীযুক্ত এন. কে. রুস্তমজী, বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ও গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত এল. বি. বসনেত, তাসী নাম-গিয়াল একাডেমী স্কুলের রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করে আমি বিভিন্ন তথ্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছি।

সিকিমের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীযুক্ত বি. বি. লাল আমাকে টিবেটোলজির গ্রন্থাগার অবাধ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে এবং এই বই লেখার বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

টিবেটোলজির অধ্যক্ষ ডঃ নির্মলচন্দ্র সিংহ, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও, আমার বই-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে, যথাযোগ্য নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ দত্তও এই বই-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে কিছু কিছু বিষয় সংযোজন ও সংকলন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন. এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সিকিম গভর্ণমেণ্ট কলেজের তিব্বতী ভাষার অধ্যাপক লামা ড. রিনও টুলকুর

কাছে আমি বিশেষ ভাবে উপকৃত, তিব্বতী শব্দের অর্থ, বানান এবং তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করে তিনি আমাকে সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবিষয়ে টিবেটোলজির উপাধ্যক্ষ রিচুং রিমপোচে এবং রিসার্চ গাইড লামা কুং-ভার কাছেও আমি উপকৃত হয়েছি।

শ্রীযুক্ত ভজগোবিন্দ ঘোষ, যিনি টিবেটোলজির সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত, তাঁর কাছে যে আমি কতভাবে সাহায্য পেয়েছি তা এই আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এই বই-এর শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ করার বিষয়ে তিনিই প্রকৃত দায়িত্ব বহন করেছেন।

বইটি প্রকাশের ব্যপারে শ্রীযুক্তা কমলা মুখোপাধ্যায় আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। তিনিই ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

এই লেখার ব্যপারে আমাকে যাঁরা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে শ্রীগৌতম রায়, শ্রীকমল চৌধুরী, শ্রীগণপতি পাল, শ্রীঅরুময় রায় প্রমুখের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আর বলা মাত্র, যিনি আমাকে বিভিন্ন পুরোন তথ্যের নথি, দুষ্প্রাপ্য ছবি ও মানচিত্র, পুরোন দিনের দলিল প্রভৃতি জোগাড় করে দিয়েছেন তিনি আমার ভ্রাতৃতুল্য, সিকিম হাইকোর্টের এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার শ্রী চুল-তেন লেপচা। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক।

সবশেষে, যিনি আমার সবসময়ের সঙ্গী, মিত্র, পরামর্শদাতা, শিক্ষক, ও সহযোগীর ভূমিকা নিয়ে সর্বদা সাহায্য করেছেন তাঁর নাম বোধহয় বিশেষ ভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। আমরা দুজনে আমাদের সব সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা, খ্যাতি-গৌরব ভাগ করে গ্রহণ করি। এই বই যদি খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়, তবে তা আমাদের দুজনেরই সমান প্রাপ্য।

—অপর্ণা ভট্টাচার্য
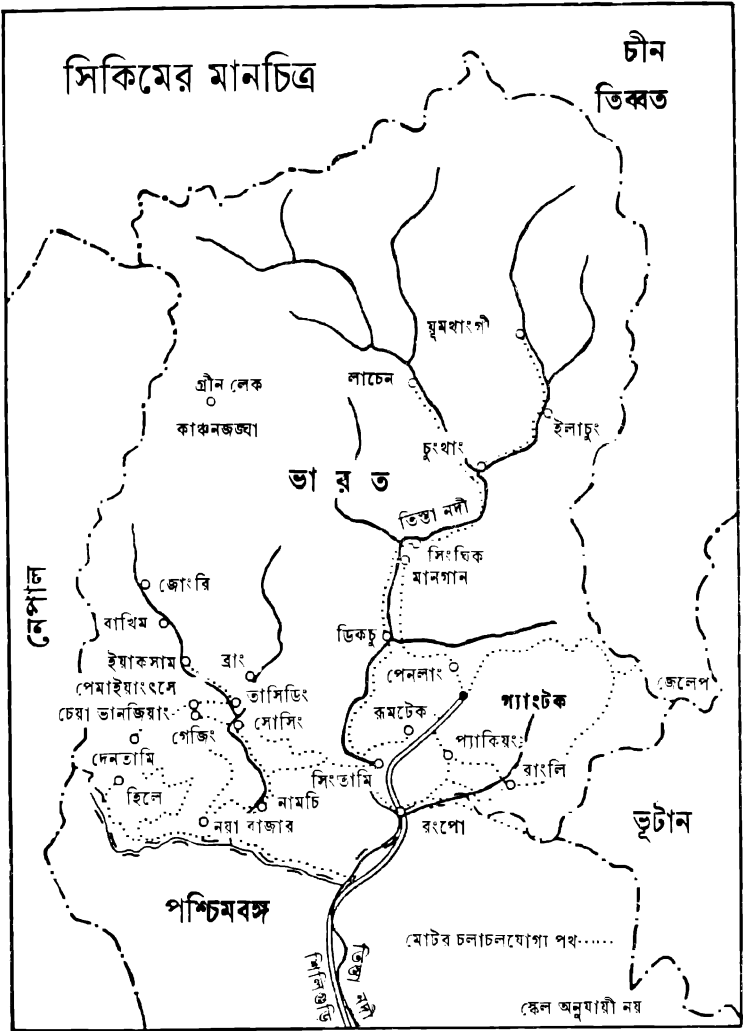
সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার অনুমতিক্রমে সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার মানচিত্রের ভিত্তিতে অঙ্কিত।

প্রথম অধ্যায়

ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

মাথায় সূর্যকরোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘার কিরীটি, অর্কিডের কর্ণভূষণ, কণ্ঠে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পমালিকা, সিঁড়ি-ক্ষেতের ডুরে কাটা অঙ্গাভরণ এলাচী সৌরভে মাখা, চরণ যুগল ঘিরে নূপুরের নিক্কন তুলে বয়ে চলেছে তিস্তা ও রঙ্গীত—এই অপরূপ রূপে রূপসী সিকিম অভ্যর্থনা জানাচ্ছে সকলকে, 'তাসী ডেলে, তাসী ডেলে'—স্বাগতম, স্বাগতম। দেশ বিদেশ থেকে তার রূপের আকর্ষণে মানুষ ছুটে আসে আর বলে যায়, 'তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।'

গল্পের মাধ্যমে শোনা যায়, এই অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানটির অস্তিত্ব বিগত কয়েক শত বছর আগেও ছিল সভ্য জগতের অগোচরে। এমন যে স্বর্গসমা ভূমি এই ধরণীতেই রয়েছে তা প্রথম আবিষ্কার করেন গুরু পদ্মসম্ভব তাঁর ভারত থেকে তিব্বত যাত্রার পথে, এবং তিব্বতে পৌঁছনর পরে তিনিই নাকি এই স্থানের কথা তিব্বতীদের কাছে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তিব্বতীয় লামা সম্প্রদায় এখানে তিব্বতী ধারায় ধর্মরাজ্য স্থাপন করে এবং তিব্বতের রাজবংশোদ্ভূত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এনে 'চো-গিয়াল' বা ধর্মরাজা উপাধিতে ভূষিত করে রাজপদে অভিষিক্ত করে 1642 খ্রীষ্টাব্দে।

'সিকিম' এই নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী শোনা যায়। তিব্বতী ভাষায় এর নাম 'বেউল দেমাজং' অথবা 'দেনজং' যার অর্থ 'অজ্ঞাত ধান্যক্ষেত্র'। তিব্বতীদের কাছে ধান জাতীয় শস্যের কথা ছিল অজানা এবং এখানেই নাকি তারা প্রথম ধানের ফলন দেখতে পায়। তারই ফলে এই নামকরণ। 'সিকিম' নামটি অপেক্ষাকৃত নবীন। এ বিষয়েও গল্প প্রচলিত আছে। নেপালের কোন এক লিম্বু রমণীর সঙ্গে বিবাহ হয় এখানকার একজন রাজপুরুষের। নববধূ সিকিমের এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বলে ওঠে,—'সু-হীম' বা 'সু-খীম'—নতুন গৃহ, সুখের

গৃহ। লিম্বু বধুর সেই উচ্ছ্বাসময় বাণী, 'সু-খীম' ধীরে ধীরে 'সিক্‌খিম' বা সিকিমে রূপান্তরিত হয়। ইংরেজদের আগমনের পরে তাদের প্রভাব এবং বিপুল আকারে নেপালীদের অনুপ্রবেশও 'সিকিম' নামটি প্রচলিত হওয়ার অন্যতম কারণ। এর আগে পর্যন্ত রাজপরিবারের ঐতিহাসিক কাগজপত্রে কিন্তু 'দেমাজং' বা 'দেনজং' নামটিরই ব্যবহার দেখা যায়।

2818 বর্গমাইল আয়তনের এই ছোট্ট সুন্দরী রাজ্যটি যে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই অতুলনীয়া তাই নয়, ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর উত্তরে চীন-শাসিত তিব্বত, পূর্বে ভুটান ও চুম্বী উপত্যকা, পশ্চিমে নেপাল, এবং দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ। 1975 সাল পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি চতুঃপার্শ্বে বৃহত্তর রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও আপন স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বাধীন রাজ্য রূপে বিরাজ করেছে ; যদিও 1890 সালের পর থেকে সিকিম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের 'সংরক্ষিত' রাজ্য হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল। 1975 সালে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার সংযুক্তি ঘটে এবং ভারতের দ্বাবিংশতিতম রাজ্য হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

সিকিমের বর্তমান যে আয়তন ও ভৌগলিক সীমারেখা পাওয়া যায়, পূর্বে তার চেয়ে আয়তন অনেক বিস্তৃত ছিল। সিকিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরে এর সীমার মধ্যে ছিল—উত্তরে তিব্বতের থাঙ্কা-লা, পূর্বে চুম্বী উপত্যকা, পশ্চিমে অরুণ নদী ও দক্ষিণে ভারতের পূর্ণিয়া এবং কিষণগঞ্জ। সমগ্র দার্জিলিং জেলা 1835 সাল পর্যন্ত সিকিমের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বিভিন্ন সময়ের বহিরাক্রমণে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে সিকিমকে কালে কালে তার ভূমির অংশ হারাতে বা ছাড়তে হয়েছে।

সমগ্র সিকিম রাজ্যটি প্রধানত চারটি জেলায় বিভক্ত—যথা, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। দক্ষিণ-পূর্বে 'রঙ্ক-পো' সিকিমের প্রবেশদ্বার—পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সীমান্ত রেখা তৈরী হয়েছে 'রঙ্ক-পো-চু' খোলার ধারা দিয়ে। পূর্বে 'গ্যাংটক' শহর সিকিমের রাজধানী,—বলা চলে একমাত্র শহর। পশ্চিমে 'গ্যালসিং' বা 'গেজিং', দক্ষিণে 'নাম-চি' এবং উত্তরে 'মঙ্গন' জেলা সদর হিসেবে গণ্য হলেও তা নিতান্তই পাহাড়ী গ্রাম মাত্র। ছোট ছোট বাজারকে কেন্দ্র করে এমনই আরও কয়েকটি পার্বত্য গ্রাম বা বস্তী নিয়ে এই ক্ষুদ্রতম রাজ্যটির অস্তিত্ব।

সিকিম যে সত্যই সুখের আলয় তা যিনি একবার এখানে এসেছেন তিনিই উপলব্ধি করেছেন। বিদেশী অভিযাত্রীরা সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মুগ্ধ বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন অনেক কথা।...indescribably magnificent the view of the

snowy mountains, *(Joseph Hooker)* ; '...bounded thus by eternal snows, and being itself a land of deep gorges and precipitous mountains, clothed with forest and verdure to their very summits, Sikkim is a land of extraordinary beauty' *(Colman Macaulay)* ; ' ..this mixture of scientific and picturesque interest —has rendered Sikkim the desire of everyone to behold' *(Major Marton)* ; '...We were all in raptures with the beauty of the scene' *(Richard Temple)*। তবুও তা যেন অবর্ণনীয়ই রয়ে যায়।

সত্যাই মনে হয়, প্রকৃতি যেন শিল্পীর নিপুণ তুলির টানে এঁকেছেন এই রূপসী রাজ্যটিকে। এখানে ছয় ঋতু যেন এক বিরাট রঙ্গশালায় নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে চলেছে। তবে গ্রীষ্ম এখানে রুদ্ররূপে নয়, শিবসুন্দর মূর্তিতে দেখা দেয়। তাই ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ যখন প্রকৃতির দহন জ্বালায় দগ্ধ হয়, সিকিমের আকাশ বাতাস তখন স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে মাখানো। এখানে বর্ষা আসে তপের তাপের বাঁধন কেটে নয়, আসে শ্যামল বধূর সুন্দর মনোহর বেশে। প্রকৃতির সঙ্গে চলে তার লীলাখেলা—কখনও ঘন কুয়াশার ধূসর অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যায় সমস্ত জগত, কখনও বা পর্বত চূড়ার উপরে মেঘ ছেঁড়া আলো এসে উজ্জ্বল হাসি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ফিরোজা উপত্যকায়। শরৎ ও বসন্ত সিকিমের সবচেয়ে মনোরম ঋতু— সোনালী রোদে ঝলমলে, ফুলের সম্ভারে বর্ণাঢ্য, উৎসবে ও আনন্দে উদ্বেল নবোঢ়া বধূর মতই হাস্যে লাস্যে মুখর হয়ে ওঠে সিকিম। তবে শীতের প্রতি যদি নিতান্তই বিরূপতা না থাকে, যদি কখনও কবির মত মনে হয়—'রঙের খেলার ভাই রে, আমার সময় হাতে নাই রে' তবে সিকিমের শীতকে উপভোগ করা যায় তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের চূড়ায়, কমলালেবু ও আপেলের বনে, ভুটিয়া ও লেপচা শিশুর রক্তাভ গালে, তুহিনা সন্ধ্যায় আগুনের পাশে বসে।

প্রকৃতি তার অকৃপণ দানে, উদ্ভিদ ও জীবের সমারোহে এই পার্বত্য দেশটিকে করেছে সমৃদ্ধশালিনী। গভীর অরণ্য জগত একদিকে যেমন বিচিত্র উদ্ভিদের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে কালো ভালুক, চিতাবাঘ, হরিণ, সম্বর, চমরী গাই প্রভৃতি বণ্যপ্রাণীর সমাবেশে তা হয়ে উঠেছে প্রাণময়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সিকিমে রয়েছে প্রায় দুই হাজার জাতের পাখী, ছয় শ জাতের প্রজাপতি ও অজস্র কীট-পতঙ্গ। বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে পাখীর কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে সিকিম, তেমনি প্রজাপতির পাখার বর্ণালীতে হয়ে যায় চিত্রিত। পুষ্পসম্ভারও সিকিমের কম নয়।

বসন্তে আকাশ মাতাল করে ফোটে চেরী ব্লসম, 'চাঁপ' বা ম্যাগনোলিয়ার সুগন্ধে আকুল হয়ে ওঠে বাতাস, শরৎকালে ছয় শ জাতের অর্কিড বিবিধ অলংকারে সুসজ্জিতা করে তোলে সিকিমকে। আর উত্তর সিকিমে প্রায় তের হাজার ফুট উচ্চতায় এপ্রিল ও মে মাসে যখন আঠার কিলোমিটার ব্যাপী রডড্রেনড্রন ফুলের বনে আটচল্লিশ রকম রঙের মাতন লাগে, তখন এই পৃথিবীতেই নন্দন কাননের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের স্বরূপ যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সিকিমের সবচেয়ে বড় সম্পদ,—চির তুষারাবৃত, মহাদ্যুতিময়, মহান বিভূতিতে বিরাজমান 'খাঙ-চে-জো-ঙ্গা' বা কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গমালা।[1] অনেকের মতে, তিব্বতী 'খাঙ-চে-জো-ঙ্গা' নামেরই সংস্কৃতায়ন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। সিকিমবাসীর কাছে এই শৃঙ্গমালা গিরিদেবতারূপে আদৃত। পাঁচটি শৃঙ্গ বিশিষ্ট এই শৃঙ্গমালাকে 'পঞ্চরত্ন' নামেও ভূষিত করা হয়েছে। তুষারমৌলি এই সৌন্দর্যের বৈভব মানুষকে শুধু পরম বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে। এই সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে তাই বার বার প্রণতি জানিয়ে বলতে হয়, 'এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ।'

সিকিমের কয়েকটি বিখ্যাত পর্বত শৃঙ্গ

কাঞ্চনজঙ্ঘা—28,168 ফুট, সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এর বাঁ দিকে কুম্ভকর্ণ—25,300 ফুট, নরসিং—19,111 ফুট এবং পানদেম—22,000 ফুট। কাঞ্চনজঙ্ঘার ডান দিকে রয়েছে সিম্বো—22,400 ফুট, নেপাল—23,500 ফুট, টেন্ট—24,000 ফুট, পিরামিড—23,400 ফুট, জোন সাঙ—24,416 ফুট, ল্হনাক—22,015 ফুট।

সিকিমের কয়েকটি গিরিপথ

পূর্বে—জেলেপ-লা, নাথু-লা, চো-লা এবং থাঙ্কা-লা
উত্তরে—ডোঙ-কিয়া, কোঙড়া-লামু ও না-কু
পশ্চিমে—কাঙ-লা-চেন ও চিয়া-ভঞ্জন।

সিকিমের প্রধান নদীসমূহ

তিস্তা ও রঙ্গীত নদী যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে

---

1. খাঙ-চে-জো-ঙ্গা তিব্বতী শব্দের অর্থ পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট তুষার শৃঙ্গ। খাঙ-চে=তুষার শৃঙ্গ, জো=রত্ন, ঙ্গা=পাঁচ।

দক্ষিণে 'মেল্লী' নামক স্থানে মিলিত হয়েছে। স্থানীয় লেপচা ভাষায় নদী দুটির নাম 'রঙ-নীয়' (তিস্তা) এবং 'রঙ-নীত' (রঙ্গীত)। এই নদী দুইটিকে প্রেমিক ও প্রেমিকা রূপে কল্পনা করা হয় এবং নদী দুইটিকে নিয়ে স্থানীয় ভাষায় অনেক কাব্য ও উপকথা প্রচলিত রয়েছে। তিস্তার উপনদীসমূহ যেমন—লাচুং-চু, জেমু-চু, চাকুং-চু, তালুং-চু এবং তাংপো-চু তাকে পরিপুষ্ট করেছে।

সিকিমে কয়েকটি প্রাকৃতিক জলাশয় বা লেক রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমে 'খেচি পেরী' এবং পূর্বে 'ছাঙ্গু' লেক খুবই প্রসিদ্ধ। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এই জলাশয়গুলি অত্যন্ত পবিত্র ও দৈবিক গুণসম্পন্ন বলে খ্যাত।

সিকিমে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে, যেমন—পুট্-সাচু, রালং-সাচু, ইয়ুং-থাং, মোমে প্রভৃতি।

বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা

হিমালয় সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল বলে সিকিমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রচুর। তবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে মৌসুমী বায়ু প্রবেশের পথে বাধা হয়ে ওঠে। ফলে কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট কম, যেমন লেহনাক উপত্যকাকে প্রায় শুষ্ক এলাকা বলা যায়। আবার পূর্বে গ্যাংটক ও রোঙলিতে, যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে 300 (তিনশত) সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, সেখানে উত্তরে থাঙ্গু এলাকায় গড়ে মাত্র 85 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। সিকিমের মধ্যভাগে এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত শৃঙ্গের নিম্নভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী।

উচ্চতার পার্থক্য অনুসারে সিকিমের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তাপমাত্রারও যথেষ্ট তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। গ্যাংটকে এপ্রিল মাস থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত তাপমাত্রা সাধারণতঃ 21° ডিগ্রি থেকে 22° ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। কিন্তু নভেম্বর মাস থেকে জানুয়ারী মাসে তাপমাত্রা 18.1° ডিগ্রি থেকে 10.3° ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। উত্তর সিকিমের লাচেন ও লাচুং অঞ্চলে এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত 14.3° ডিগ্রি থেকে 17° ডিগ্রি সর্বোচ্চ এবং নভেম্বর মাস থেকে জানুয়ারী মাসে 10° ডিগ্রি থেকে 7° ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে। তুষারাবৃত অঞ্চলে তাপমাত্রার সর্বোচ্চ পরিমাণ 6.9° ডিগ্রি থেকে সর্বনিম্ন 0.5° ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়। উত্তর সিকিমে শীতকালে প্রায়ই তুষারপাত হয়। গ্যাংটক শহরে

প্রতিবছর না হলেও কখনও কখনও শীতকালে তুষারপাত হয়ে থাকে। মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রায়ই শিলাবৃষ্টি হয় এবং যথেষ্ট বড় আকারের শিলাপাত হতে দেখা যায়।

কৃষিজ পণ্য

সিকিমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রচুর এবং ভূমি যথেষ্ট উর্বরা হওয়া সত্বেও তুলনা-মূলক ভাবে সিকিমে কৃষিকাজের পরিমাণ কম। এর প্রধান কারণ, এখানকার লেপচা-ভুটিয়া অধিবাসীরা তেমন কৃষিনির্ভর ছিল না। সিকিমে ধান চাষের প্রচলন প্রকৃতপক্ষে নেপালীদের অনুপ্রবেশের পরে শুরু হয়, যদিও লেপচা-ভুটিয়া নির্বিশেষে ভাত এখন সকলেরই প্রধান খাদ্য। এর আগে ভুটিয়ারা এক ধরণের ধানের চাষ করতো, অত্যন্ত কর্কশ ও লাল রং-এর সেই ধানকে বলা হত 'লামাচুম'। সিকিমের প্রধান কৃষিজ পণ্য বড় এলাচ,—ভুটিয়া-লেপচাদের প্রধান আয়ের উৎসও বটে। পৃথিবীর মধ্যে সিকিমেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে বড় এলাচ উৎপন্ন হয় ও রপ্তানী হয়। তবে বর্তমানে পশ্চিম সিকিমে ও অন্যত্রও প্রচুর ধানের চাষ হচ্ছে। অন্যান্য পাহাড়ী অঞ্চলের মত এখানেও 'টেরাস-কালটিভেশন' বা সিঁড়ি-ক্ষেত প্রথায় চাষ করা হয়। নিম্নাঞ্চলে কোন কোন জায়গায় লাঙ্গল ও গরু দিয়ে চাষ করা হলেও প্রধানত 'টোক্‌চে' বা কুঠার দিয়ে জমি তৈরী করা হয়। সমস্ত শস্যই এই সিঁড়ি-ক্ষেতে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য শস্যের মধ্যে ভুট্টা, বার্লি, যব ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। 'ফাবর' নামে স্থানীয় এক ধরণের শস্য উৎপাদন করা হয় এবং এর থেকে ভাত ও রুটি জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

সিকিমে বিভিন্ন ধরণের শাক-সব্জিও উৎপন্ন হয়, এর মধ্যে প্রধান আলু, কপি, বাঁধা কপি, মটর শুঁটি, বীন, টমেটো, গাজর, শালগম প্রভৃতি প্রধান। 'ইস্‌কুস্‌' (স্কোয়াশ) নামে একধরণের পাহাড়ী সব্জি বিনা আয়াসে সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে ফলে থাকে। লাউ ও কুমড়ো গাছের মত এই স্কোয়াশের গাছও লতান হয় এবং এর ডগা ও পাতা, ফল ও শিকড় সমস্তই সব্জি করে খাওয়া যায়। 'বাইশাক'র স্থানীয় লোকদের অত্যন্ত প্রিয় সব্জি। কিন্তু এখানকার লেপচা-ভুটিয়া নেপালী ও অন্যান্য সমস্ত উপজাতিই প্রধানত মাংসাশী। উচ্চবর্ণের হিন্দু নেপালীরা ছাড়া সকলেই গরু, মোষ, শূয়োর, খাসী প্রভৃতি সমস্ত মাংসই খেয়ে থাকে। সিকিমী ভাষায় গরু মোষের মাংসকে বলা হয় 'লাঙসা', খাসীর মাংস 'রাসা', ও শূয়োরের মাংস 'ফাকসা'। লেপচা ভুটিয়াদের মধ্যে শাক-সব্জির চেয়ে মাংস খাওয়ার প্রতি বেশী আকর্ষণ দেখা যায়। অনেক সময় এরা পশু পাখীর মাংস কয়েকদিন ঘরে রেখে

পচিয়ে খেতে পছন্দ করে। বাজারেও বাসি মাংস বিক্রী হতে দেখা যায়। পাহাড়ী অঞ্চলের লোকরা মাছ খেতে তেমন অভ্যস্ত নয়। পাহাড়ের খরস্রোতা নদীগুলিতে মাছ পাওয়া যায় না বলেই হয়তো তাদের এই অভ্যাস গড়ে ওঠে নি। মাছকে এরা বলে 'নাসা'।

সিকিমে এতদিন পর্যন্ত জমির বন্টন ব্যবস্থাতে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত ছিল। সবার উপরে চো-গিয়াল বা রাজা, তার অধীনে বিভিন্ন জমিদার বা 'কাজী', কাজীদের অধীনে বস্তীওয়ালা বা রায়ত ইত্যাদি—এই ভাবে জমির মালিকানা ভাগ করা ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভূমিহীন কৃষক এই সমস্ত জমির মালিকদের জমিতে চাষ করতো। তবে উত্তর সিকিমের লাচেন ও লাচুং গ্রামে, এখনও সমবায় প্রথায় জমির বন্টন করা হয়ে থাকে। সমাজতান্ত্রিক রীতির এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় এই দুটি গ্রামে। সেখানে পাহাড়ের কোন বনভূমি নির্বাচন করে তা পরিষ্কার করে জমি তৈরী করা হয়। তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন অনুসারে সেই জমি ভাগ করে দেয়। জমির হিসাব করা হয় 'পাথী'র মাপে.—এক পাথীর পরিমাণ প্রায় পাঁচ কেজির সমান। অর্থাৎ জমিতে কত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হতে পারে তার অনুপাতে জমি ভাগ করা হয়। গ্রামের প্রধান বা 'পিপ্পন' গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হন—তিনি গ্রামের সর্বময় নেতা ও কর্তা, সকলের শ্রদ্ধাভাজন। ছোটখাট অপরাধের বিচারও তিনিই করেন এবং শাস্তিও দেন। সিকিমের লাচেন ও লাচুং গ্রাম দেখে তৎকালীন ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার জন ক্লড হোয়াইট লিখেছেন—'an unusual and almost communistic government of their own. On every occasion the whole population meet at a 'Panchayat' or council. where they sit in a ring in consultation. Nothing, however small, is done without such a meeting.' এই প্রথা আজও অপরিবর্তিত রয়েছে। এই গ্রাম দুটিতে প্রধানত ভুটিয়া অধিবাসীরা বসবাস করে। এখানকার আরও একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে যে এখনও সেখানে প্রাচীন পলিয়ানড্রাস বা বহুভর্তৃক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সমবায় প্রথার সাফল্যের এইটিই হয়তো প্রধান কারণ।

শিল্প

কৃষি ছাড়া পশুপালন ও কুটীর শিল্প সিকিমের সমস্ত অধিবাসীদের অন্যতম জীবিকা। প্রকৃতপক্ষে লেপচা-ভুটিয়া পরিবারগুলির প্রধান জীবিকাই হচ্ছে

পশুপালন। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরী তাদের গৃহগুলিতে নীচের তলায় পশুদের রাখার জায়গা করে উপরে পরিবারের লোকজন বাস করে। পশুপালন ছাড়া কুটীর শিল্পেও এরা খুব পারদর্শী। লেপচারা বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, ডালা, কৌটা টুপি, বাক্স প্রভৃতি নানা ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করে। ভূটিয়া নারী-পুরুষ উভয়েই নিজেদের বাড়ীতে বসেই নানা ধরণের কার্পেট বুনে থাকে এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য মণ্ডিত কাঠের আসবাবপত্র তৈরী করে, যার শিল্পসৌন্দর্য সত্যই মন-মুগ্ধকর। পশম তৈরী ও পশম দিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ তারা নিজেরাই তৈরী করে।

বিশেষ সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে সিকিমে ভারী অথবা ক্ষুদ্র কোন শিল্পই এতদিন গড়ে ওঠে নি। এমনকি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তরাই এলাকা চা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ হলেও সিকিমে কোন চা বাগিচা স্থাপন করা হয় নি। সিকিমে চা-শিল্প গড়ে না ওঠার কারণ, এবিষয়ে প্রাক্তন সিকিম রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদন। সম্ভবতঃ চা-শিল্পীদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এবং সমগ্র দার্জিলিং ও তরাই অঞ্চলের চা-শিল্প যাতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন না হয়, ইংরেজ তার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, ব্রিটিশ সরকারের চাপের কাছে সিকিম রাজাদের তাই নতি স্বীকার করতে হয়। সুতরাং সিকিমের জমি চা-শিল্পের পক্ষে অনুকূল হওয়া সত্বেও কোন চা-বাগিচা তৈরী হয় নি।

সম্প্রতি সিকিমে একটি চা-বাগিচা গড়ে উঠেছে এবং এই চা স্বাদে ও গন্ধে যথেষ্ট জনপ্রিয়। এই সঙ্গেই সিকিমে গড়ে উঠেছে ফল সংরক্ষণ, দেশলাই, সিগারেট প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান। সিকিম ডিসটিলারীও এর অন্যতম। সিকিমের অর্থনীতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যকে এতদিন তেমন ভাবে কাজে লাগানো হয় নি। সবচেয়ে বড় কথা এখানে পরিশ্রমী মানুষের অপ্রতুলতা নেই। সিকিমের এই সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে ভবিষ্যতে সিকিম অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। □

দুই

সংস্কৃতি ও প্রথা

লেপচা, তিব্বতী বা ভুটিয়া এবং নেপালী এই তিনটি জাতি সিকিমের প্রধান অধিবাসী। এ ছাড়া আরও কিছু পার্বত্য উপজাতি সিকিমে বসবাস করে, এদের মধ্যে উল্লেখ্য—রাই, তামাং, শেরপা, লিম্বু বা চোঙ, মঙ্গার ইত্যাদি। তবে সিকিমের এই উপজাতিগুলিকে বর্তমানে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—লেপচা-ভুটিয়া বংশোদ্ভব সিকিমী এবং নেপালী বংশোদ্ভব সিকিমী। 'সিকিমী' বলে প্রকৃতপক্ষে কোন জাতি নেই। তিব্বতী বা ভুটিয়াদের সঙ্গে অন্যান্য উপজাতিদের সংমিশ্রণের ফলে সিকিমে যে এক মিশ্র ভুটিয়া জাতি উদ্ভূত হয়েছে তারাই নিজেদের "সিকিমী" বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের ধর্ম, আচার আচরণ, প্রথা ও সংস্কৃতি, ভাষা সমস্তই তিব্বতী ধারার অন্তর্গত। এদেরকে তিব্বতী না বলে 'সিকিম ভুটিয়া' বলে গণ্য করা হয়। সিকিমের অধিকাংশ লেপচা-ভুটিয়া অধিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। লেপচাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী রয়েছে। অপরদিকে নেপালী গোষ্ঠীর অধিবাসীরা প্রায় সকলেই হিন্দুধর্মাবলম্বী। তামাং, শেরপা, লিম্বু প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন অনুসারে তাদের নেপালী গোষ্ঠী বা লেপচা-ভুটিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নেপাল ও তিব্বতের ভৌগলিক নৈকট্য এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই উপজাতি গুলির মধ্যে একাধারে নেপালের হিন্দুধর্ম এবং তিব্বতের মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

সারল্য, ঔদার্য ও ধর্মপরায়ণতা সিকিমের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যই সম্ভবত এদেরকে সৎ-প্রকৃতি করেছে। বিশেষত 'বস্তী' বা গ্রামাঞ্চলের মানুষদের দেখলে মনে হবে যেন এক পরম বিশ্বাসের ছবি আঁকা রয়েছে এখানকার আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে। তাই সিকিমের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে

এসে পর্যটকগণ মুগ্ধ হয়ে যান সিকিমবাসীর সহৃদয় আতিথ্যে। আজকের অশান্ত বিশ্বে যখন সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক হানাহানি মানুষের জীবন থেকে সব শান্তি, সব নিরাপত্তাবোধ হরণ করে নিচ্ছে, তখন সিকিমের এই পরম নিশ্চিন্ততায় এসে সকলকে বিস্মিত হতে হয়,—এখানে নেই কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নেই রাজনৈতিক খুনোখুনি, জনগণের সম্পত্তি-নাশ এমন কি দুই একটি ছোটখাট চুরির ঘটনা অথবা নেহাতই হঠাৎ কোন উত্তেজনার বশে খুন করে ফেলার ঘটনা ছাড়া নেই কোন বড় গর্হিত অপরাধের নজীর। সিকিমের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, ধর্মভীরু, কলহ বিমুখ ও আইন-অনুগত।

আরও একটি বিষয় সিকিমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সিকিমের কোনখানে দারিদ্রের নগ্নরূপ উলঙ্গ ভিখিরি সেজে এসে হাত পেতে দাঁড়ায় না। সিকিমের কোন প্রান্তে একজনও স্থানীয় অধিবাসীকে ভিক্ষে করতে দেখা যায় না। এখানকার উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী। শ্রমকে এখানে লজ্জা বা ঘৃণার চোখে দেখা হয় না। এমন কি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকেও দেখা যায়, ভিক্ষে করা বা নিজেকে অবাঞ্ছিত বোঝা করে তোলার পরিবর্তে তারা কোন না কোন ভাবে সমাজে ও পরিবারের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে।

সিকিমের জীবনযাত্রাও অত্যন্ত সহজ সরল। আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিবৃত্তির জটিলতায় এখানকার জীবন ভারাক্রান্ত নয়। 'খাও দাও স্ফূর্তি কর'—এইটিই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। জ্ঞানচর্চা বা মানসিক কর্ষণের অভ্যাস এখানকার শিক্ষিত সমাজেও তেমনভাবে গড়ে উঠে নি। তাই স্বাভাবিক কারণেই সিকিমের সংস্কৃতি এখনও সেই প্রাচীন লোকসংস্কৃতির স্তরেই রয়ে গেছে। অন্যদিকে, আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত সমাজে পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার অন্ধ অনুকরণের প্রবণতাও অত্যন্ত প্রবল।

শৌখিনতা ও পোষাকপ্রিয়তা এখানকার নারী পুরুষ সকলের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমনকি গ্রামের মানুষের মধ্যেও এই শৌখিনতার ঝোঁক দেখা যায়। বিচিত্র রঙ বেরঙের পোষাকে সজ্জিত হয়ে দলে দলে নারী পুরুষ আসে হাটে। সারাদিন ধরে তারা স্ফূর্তি করে, মদ্যপান করে, কেনাবেচা করে আর অকারণ হাসি মসকরা, হুল্লোড় করে। বাজারের এমন রঙ্গীণ প্রাণবন্ত রূপ অন্য কোথাও চোখে পড়ে না। এই হাটের দিনেই অনেক তরুণ-তরুণীর মন দেওয়া-নেওয়ারও সুযোগ ঘটে যায়।

সিকিমে মদ প্রায় চায়ের মতই স্বাভাবিক পানীয়। শীতের প্রাবল্য হয়তো এর

অন্যতম কারণ। স্থানীয় মদ 'জাঁড়' বা 'ছাঙ' 'কোছো' নামক এক প্রকার শস্য থেকে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই তৈরী করা হয়। বাঁশের খুঁটির তৈরী গ্লাসে বাঁশের পাইপ দিয়ে এই মদ্যপানের রীতিও অভিনব। উৎসবে অনুষ্ঠানে সর্বত্র এই 'ছাঙ' দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। এমনকি অন্তঃসত্ত্বা রমণীকে প্রসবের আগে ও পরে এই ছাঙ পান করান হয়। এই ছাঙ নাকি খুবই স্বাস্থ্যকর ও বলকারক পানীয়। একজন তিব্বতী বন্ধু সরস মন্তব্য করে বলেন যে 'ছাঙ' তাদের কাছে 'কোদোমাইসিন' বা স্বাস্থ্যকর টনিক স্বরূপ।

লেপচা, ভুটিয়া এবং নেপালী এই তিন প্রধান জাতি সিকিমে সুদীর্ঘ সহবাসের মধ্যে পারস্পরিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, কোনো জাতিই তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট একেবারে বর্জন করে নি। শুধুমাত্র আকৃতি ও দৈহিক গঠনেই নয়,—পোষাকে পরিচ্ছদে, আচারে আচরণে, ভাষায় প্রত্যেক সম্প্রদায়কে পৃথক পৃথক ভাবে চেনা যায়। তাই 'থারা' পরিহিত লেপচা, 'বাক্কু' পরিহিত ভুটিয়া ও 'দাওরা সুরুয়াল' পরিহিত নেপালী দেখা যায় পথে ঘাটে, নানা স্থানে। বিশেষ করে উৎসবে ও অনুষ্ঠানে নিজস্ব পোষাক পরিধান করে আসাই রীতি। তবুও একদিকে যেমন তিব্বতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতি অন্যান্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি সহজবোধ্য নেপালী ভাষা হয়ে উঠেছে সিকিমের সর্ব সাধারণের ভাষা বা *Lingua franca*। তিব্বতী প্রথায় "খাদা" বা শ্বেত উত্তরীয় দিয়ে অভ্যর্থনা করার রীতি এখন সিকিমের নিজস্ব প্রথা হয়ে উঠেছে। হিন্দু নেপালী ও অন্যান্য উপজাতিরা সকলেই এই প্রথা অনুসরণ করে থাকে। আমাদের ফুল ব্যবহারের মতই এখানে খাদার ব্যবহার হয়ে থাকে। দেবতাকে অর্ঘ দিতে, অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে, নবাগত ও নববিবাহিতকে অভিনন্দিত করতে, মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে সর্বত্র এই 'খাদা চড়ান' রীতি পালিত হয়ে থাকে। ঠিক একই ভাবে 'থুক্পা' এবং 'মো-মো' হয়ে উঠেছে সিকিমের সর্বজনের প্রিয় ও আকর্ষণীয় খাদ্য। আর সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও রেষারেষি কিছুটা দেখা গেলেও, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এখানকার সমস্ত সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব মানুষের এক পরম গুণ। প্রত্যেকে প্রত্যেকের 'দাজু ও বহিনী' (দাদা ও বোন) শুধুমাত্র সম্বোধনেই নয়, সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরস্পরের আত্মীয়তাবোধের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একে অপরের সাহায্যের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত এগিয়ে আসে! তাই সিকিমে একজন অতি সাধারণ লোকের শবযাত্রায় যে জনসমাগম হয় তা

বিশেষ লক্ষণীয়। আপন স্বাতন্ত্র ও সংস্কৃতি বিসর্জন না দিয়েও সংহতি রক্ষার এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সিকিমের সমস্ত উপজাতিগুলিরই নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং বিভিন্ন ভাষায় লোক সাহিত্যও গড়ে উঠেছে। তবে সিকিমের সরকারী ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে— ভুটিয়া, লেপচা, নেপালী ও লিম্বু। এছাড়া ইংরেজী ও হিন্দি সরকারী ভাষা হিসেবে প্রচলিত। সিকিমী জাতির মত 'সিকিমী' ভাষা বলেও বাস্তবিক কোন বিশেষ ভাষা নেই। বর্তমানে 'সিকিমী' বলে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা মূলতঃ তিব্বতী ভাষারই অপভ্রংশ বা মিশ্রিত তিব্বতী বলা যায়। তবে আগেই বলা হয়েছে, সিকিমের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করার ভাষা প্রধানত নেপালী। প্রায় প্রত্যেকেই নেপালী ভাষায় কথা বলতে পারে। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী ও নেপালী, যদিও অন্যান্য ভাষাও শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত। নেপালী ও তিব্বতী ভাষা স্নাতক স্তরেও পড়ান হয়।

প্রথা

সিকিমের বৌদ্ধধর্মী ভুটিয়া-লেপচা সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, ধর্ম, গোম্পা ও লামা। তাদের প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানগুলি সেই ধর্ম-সংস্কার থেকেই উদ্ভূত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের জীবন প্রবাহকে তারা ধর্মনির্দেশিত বলেই মনে করে আর সেই নির্দেশের প্রত্যক্ষদ্রষ্টারূপে লামাদের বিভিন্ন অনুশাসন পরম বিশ্বাসে মেনে চলে। এদের প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করলে তার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। যদিও সিকিমে এখন হিন্দুধর্মী নেপালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবু সিকিমের প্রথা বলতে বৌদ্ধধর্মী ভুটিয়া-লেপচা সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানগুলিকেই উল্লেখ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নেপালের হিন্দুধর্মী নেপালীদের আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-সংস্কৃতি ভারতের ব্রহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রহ্মণ্য সভ্যতা থেকেই গড়ে উঠেছিল। নেপালীরা এখনও সেই ধর্ম সংস্কৃতির ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে। সিকিমে নেপালীরা এসেছে অনেক পরে এবং এখানকার দৃঢ় বৌদ্ধ সংস্কৃতির ভিতকে আজও তারা ভাঙতে পারে নি। এজন্য সিকিমের ভুটিয়া-লেপচা সমাজের প্রথাগুলিই এখানে বর্ণনা করা হল।

জন্মকালীন প্রথা

বৌদ্ধধর্মই প্রথম নারী ও পুরুষের সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল। তিব্বত, সিকিম ও ভুটানের বৌদ্ধ সমাজে মহিলাদের এই সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা

বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে আজও আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনরা কন্যার জন্ম হলে ঠিক ততটা খুশীতে ভরে ওঠেন না, যতটা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন পুত্রের জন্ম হলে। কন্যা ও পুত্রের জন্মের পরে যে আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তার মধ্যেও থাকে অনেক পার্থক্য। কন্যা সন্তানকে এখনও বোঝা বলে মনে করা হয় বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু সিকিমের এই বৌদ্ধধর্মী ভুটিয়া-লেপচা সমাজে পুত্র বা কন্যা উভয়েই সমান আদরণীয়। কন্যার জন্মকেও তাই তারা একইভাবে স্বাগত জানায়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এদের নারীর প্রতি সমান মর্যাদা দানের ঔদার্য দিয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবু এর পিছনে আরও দুটি বিশেষ কারণ রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, তিব্বতী বা ভুটিয়াদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। দ্বিতীয়তঃ, এদের মধ্যে কোন কন্যাপণ দেওয়ার প্রথা ছিল না। পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে তাই ভালবাসার তারতম্য সৃষ্টি হয়নি। এজন্য পুত্র ও কন্যার জন্মের পরে একই প্রথা বা অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

কোন মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পরে তার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। আধুনিক শিক্ষিত পরিবারে প্রসূতির বিষয়ে ডাক্তার বা হাসপাতালের পরামর্শ নেওয়া হলেও, একই সঙ্গে লামাদের কাছেও তার ও তার ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় নির্দেশ নিতে দেখা যায়। লামারা গণনা করে প্রয়োজনমত তাবিজ কবচ ধারণ করার জন্য দিয়ে থাকেন। কোন অমঙ্গলের সংকেত পেলে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে কখনই কোন অশুচি বা অশুভ স্থানে যেতে দেওয়া হয় না, সন্ধ্যের পরে বাইরে যাওয়াও তারা নিরাপদ মনে করে না। কারণ তাদের ধারণা যে ঐ সময় প্রেতাত্মাদের অশুভ দৃষ্টিতে প্রসূতি বা তার গর্ভস্থ সন্তানের অকল্যাণ হতে পারে। এমন কি অন্তঃসত্ত্বা মহিলার স্বামীকেও কোন মৃতের বাড়ীতে, শবযাত্রায় বা শ্মশানে যেতে দেওয়া হয় না।

সন্তান প্রসব করার জন্য হাসপাতালে যাওয়ার প্রচলন সিকিমে এখনও তেমন প্রসারলাভ করেনি। বাড়ীতেই সাধারণতঃ সন্তান প্রসব করার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, প্রসূতির স্বামীই তাকে প্রসবের সময় সাহায্য করে এবং সন্তানের নাড়ীও কাটে। শিশুর জন্মের তিনদিন পরে তারা কোন লামাকে বাড়িতে নিয়ে এসে 'ত্রু' বা পরিশোধন অনুষ্ঠান করে। লামা পবিত্র জল ছিটিয়ে তাদের গৃহ, প্রসূতি ও শিশুকে পরিশুদ্ধ করেন। এরপর শিশুর মাতাপিতা শিশু সন্তানকে নিয়ে গোম্পায় যায় এবং প্রধান লামার কাছে শিশুর নামকরণ করার জন্য অনুরোধ

জানায়। এই নামকরণ অনুষ্ঠান করার জন্য কোন নির্দিষ্ট মাস বা দিন পালন করার প্রথা নেই। শিশুর মাতাপিতা বা পরিবারের সুবিধে অনুসারে লামার সঙ্গে পরামর্শ করে দিন ধার্য হয়। সাধারণত শিশুর তিন মাস বয়স থেকে এক বছর বয়সের মধ্যেই এই নামকরণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের দিন গোম্পার প্রধান লামা শিশুর দীর্ঘ জীবনের কামনায় বিশেষ প্রার্থনা ও পূজা করেন। শিশুর মাথা থেকে সামান্য চুল কেটে নিয়ে দেবতার পায়ে অর্পণ করা হয়। লামাই শিশুর নামকরণ করেন এবং শিশুর গলায় 'খাদা' পরিয়ে দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন।[1] এখনও প্রত্যেক ভুটিয়া-লেপচা শিশুর নামকরণ করে থাকেন লামারা এবং পরবর্তী জীবনে সেই নামেই তারা পরিচিত হয়। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে ভুটিয়া-লেপচা সমাজে 'পদবী' ব্যবহার করার কোন প্রথা নেই। ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার পরে তারা 'পদবী' হিসেবে জাতি অথবা পুর্বপুরুষের নাম অথবা গ্রামের নাম ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রাক্তন রাজ পরিবারের পদবীরূপে যে 'নাম-গিয়াল' শব্দ ব্যবহার করা হ'তো তা প্রকৃতপক্ষে সিকিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লামার নাম। এদের মহিলা ও পুরুষের নামের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। একই নাম কোন মহিলার এবং কোন পুরুষের হতে পারে, এজন্য শুধুমাত্র নাম শুনেই পুরুষ না মহিলা তা চেনা যায় না।

ভুটিয়া-লেপচাদের মধ্যে শিশুর অন্নপ্রাশন বা প্রথম খাদ্য গ্রহণ করার বিষয়ে কোন বিশেষ প্রথা নেই। তবে শিশুর জন্মের আনন্দ উপলক্ষ্যে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে 'ফাঙ-সাঙ' অর্থাৎ পান ভোজের আয়োজন করে আপ্যায়ণ করতে দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানও পরিবারের সুবিধে ও সামর্থ অনুযায়ী করা হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিরা খাদা, অর্থ এবং বিভিন্ন উপহার দিয়ে শিশুকে আশীর্বাদ করেন।

জন্মের প্রথা হিসেবে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তর ও অবতারবাদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। উচ্চ পর্যায়ের সাধক লামারা মৃত্যুর আগেই পরবর্তী জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে যান এবং কোথায়, কবে, কোন পরিবারে তিনি আবার জন্ম নেবেন সে বিষয়ে নির্দেশ লিখে রেখে যান। সেই নির্দেশ অনুসারে তাঁর শিষ্যরা পরবর্তী অবতারকে অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেন। সাধারণত দু বছর পরে অনুসন্ধান শুরু করা হয়। সেই নির্দেশের লক্ষণ যুক্ত কোন শিশুকে পাওয়ার পর

1. এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় "ছে-ড্রুব" বা "ছে-ওয়াং"।

বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে অবতার রূপে ঘোষণা করা হয়। এই প্রথা তিব্বত, সিকিম ও ভুটানে আজও একই ভাবে পরম বিশ্বাসে পালন করা হয়। তিব্বতের প্রধান দালাই লামাদের এইরকম নির্দেশ অনুসারেই খুঁজে নিয়ে আসা হতো। যাঁদের মধ্যে কোন পূর্ববর্তী লামার অবতারের লক্ষণ থাকে তাঁদেরকে বলা হয় 'রিম-পোচে'। সমাজে তাদের বিশেষ সম্মান ও সমাদর করা হয়। সিকিমের প্রাক্তন ও শেষ রাজা চো-গিয়াল পল-দেন থন্-ডুপকেও অবতার বলে মনে করা হতো।

বিবাহ

সিকিমের লেপচা-ভুটিয়া সমাজে এখনও পলিয়ানড্রি বা বহুভর্তৃক এবং পলিগামী বা বহুপত্নীক উভয় রীতিই সমধিক প্রচলিত রয়েছে। পুরুষদের মত নারীরাও এখানে একাধিক বিবাহ করতে পারে এবং একই সঙ্গে একাধিক স্বামীর ঘর করতে পারে। কয়েকজন ভাই একটি মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার রীতি উত্তর সিকিমের লাচেন ও লাচুং গ্রামে এখনও প্রায় অবশ্য পালনীয় রীতি। যৌন জীবন সম্বন্ধে এদের কোন গোঁড়ামি নেই। আর সেই গোঁড়ামি নেই বলেই পারিবারিক দ্বন্দ্বও এদের মধ্যে নেই বললেই চলে। কারণ পারিবারিক অশান্তির অন্যতম কারণ যে যৌন-ঈর্ষা, এদের মধ্যে সেই অনুভূতিও নিতান্তই কম। প্রায় যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই এদের বিয়ে হয়ে যায়। বিবাহকালে মেয়েদের কুমারীত্ব নিয়ে কোন প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না। এমন অনেক কনের বিয়ে হয়, যার হয়তো আগের দুই একটি সন্তান রয়েছে। বিবাহের সময় একটিই নীতি শুধু মানা হয়ে থাকে যে, নিকট রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এদের বিশ্বাস, সন্তানরা তার পিতার কাছ থেকে পায় শুধুমাত্র শরীরের অস্থি, কিন্তু রক্ত-মাংস ইত্যাদি দেহের যাবতীয় অংশ লাভ করে মায়ের কাছ থেকে। তাই এদের কাছে পিতা ও পিতৃকূলের আত্মীয়দের চেয়ে মাতা ও মাতৃকূলের আত্মীয়রা অনেক বেশী আপন। তাই মামাকে অভিভাবক করা হয়ে থাকে।

লেপচা-ভুটিয়া সমাজের বিবাহ পদ্ধতিও প্রায় একই রকম এবং উভয় জাতির মধ্যে অবাধ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন সামাজিক বাধা নেই। পাত্রপক্ষ প্রথমে কোন একটি মেয়েকে নির্বাচন করে তার বয়স ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়। এরপর কোন লামার কাছে গিয়ে ভবিষ্যৎ গণনা করান হয় যে এই বিবাহের ফল শুভ

হবে কিনা। লামা সমর্থন করলে একজন বর্ষীয়ান "ভামী" বা ঘটকের মাধ্যমে পাত্রীর মামার কাছে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাব উত্থাপনের সময় মামাকে খাদা, ছাঙ, এক পাথি মারোয়া, মুরগী, কিছু অর্থ ইত্যাদি উপঢৌকন দেওয়া হয়। মামা এরপর পাত্রীর পিতামাতার সঙ্গে কথা বলেন এবং যদি বিবাহের প্রস্তাব সমর্থিত হয় তবে কোন শুভ দিন দেখে উভয় পক্ষের পাকা কথা বলার দিন ধার্য করা হয়। সেই নির্দিষ্ট দিনে পাত্রের পিতা-মাতা কন্যাপক্ষের বাড়ীতে আসে এবং ভামীর মাধ্যমে কন্যার পিতাকে 'নাম-ছাঙ' বা প্রস্তাবপণ দিয়ে কথাবার্তা শুরু করে। এই নাম-ছাঙ-এর পরিমাপও হয় খাদা, ছাঙ, মারোয়া, ইত্যাদি উপহারে। কথা পাকা হলে কন্যার পিতা পাত্রকে গ্রহণ করে। কমপক্ষে তিন বছর পাত্রকে ভাবী শ্বশুরের গৃহে বাস করে তাদের কাজকর্মে সাহায্য করতে হয়। এই সময় পাত্র-পাত্রীর মেলামেশায় কোন বাধা থাকে না। উক্ত তিন বছরকে পাত্রের শিক্ষা-নবীশিকাল বলা যেতে পারে। তিন বছর উত্তীর্ণ হলে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ আবার কথাবার্তা বলে এবং লামার সাহায্যে শুভ দিন দেখে বিবাহের দিন ঠিক করে। নির্দিষ্ট দিনে উভয়পক্ষের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের উপস্থিতিতে বিরাট ভোজ ও বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এই ভোজ ও অনুষ্ঠান পাত্রপক্ষ বা কন্যাপক্ষের গৃহে আয়োজন না করে উভয়পক্ষের সুবিধে অনুসারে মাঝামাঝি কোন স্থানে করা হয়। সাধারণত পাহাড়ের ধারে যেখানে ঝর্ণা বয়ে চলেছে সেই রকম মনোরম কোন স্থানে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এর উদ্দেশ্য পাহাড়ের অটল পাথরের মত যেন নবদম্পতির জীবন দৃঢ় হয় এবং ঝর্ণার অনন্ত গতির মত তাদের বংশধারা যেন যুগ-যুগান্ত ধরে বয়ে চলে। বিবাহের অনুষ্ঠান বলতে বিশেষ কোন আয়োজন থাকে না। শুধু গ্রামের 'পিপ্ন্‌' বা প্রধান অথবা 'বিজুয়া' বা সত্যদ্রষ্টা বলে পরিচিত কোন ব্যক্তি ত্রি-রত্নের শরণ নিয়ে স্থানীয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার জন্য প্রার্থনা জানায়। এই সময়েও পাত্রের পিতামাতা বা অভিভাবক কন্যার পিতামাতাকে 'খাঁ-ছাঙ' বা কন্যাপণ হিসাবে অর্থ, বাসনপত্র, দুগ্ধবতী গাভী ইত্যাদি উপহার দেয়। উপহার প্রদান সর্বদাই ভামী বা ঘটকের মাধ্যমে করা হয়। ভোজের শেষে উভয়পক্ষই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়। এই হল বিবাহের প্রথম পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা যায় কন্যার পতিগৃহে যাত্রা। প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর প্রায় বছর খানেক অপেক্ষা করতে হয় তারপর আবার লামাদের সাহায্যে শুভদিন দেখে নিয়ে পাত্রপক্ষ কন্যাকে আনার জন্য যাত্রা করে। শুধু শুভদিন মাত্র নয়, লামারা

কন্যাকে নিয়ে আসার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নির্দেশ দান করেন,—কনের সঙ্গে কোন কোন মহিলা আসবে, তাদের বয়স কত হবে, কনে কী রঙের পোষাক পরবে, তার ঘোড়ার রঙ কি হবে, ঘোড়ার উপরে কি রঙের কুশন দিতে হবে, শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশের পর কে তাকে প্রথম খাদ্য ও পানীয় দেবে, তার বয়স কত হবে, কি কি খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হবে, কোন দিকে মুখ করে কনেকে বসতে হবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় পাত্র ও কন্যার রাশি নক্ষত্র অনুসারে গণনা করে বলে দেন এবং সেই অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে পাত্র কয়েকজন বরযাত্রী এবং একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে 'ত্রা-পণ' বা 'বরকর্তা' হিসেবে সঙ্গে নিয়ে কনের গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

কনের বাড়ীতে পৌঁছানর আগে কনের বাড়ীর মহিলারা ঠিক পথের মাঝে নানা রকম বাধা তৈরী করে রাখে। অনেক সময় তারা কাঁটা গাছের ডাল দিয়ে বরকে মারতে শুরু করে। পাত্রকে সেই বাধা ও অসুবিধেগুলি অতিক্রম করে আসতে হয় এবং কনের আত্মীয় মহিলাদের অর্থ ও উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করে রেহাই পেতে হয়। এই রীতিগুলি কতকটা বাঙালীদের স্ত্রী আচারের মত। এরা মনে করে, বর যদি ঐ বাধা ও অসুবিধেগুলি সহজে অতিক্রম করে আসতে পারে তাহলে তাদের মেয়ে অনেক স্বাস্থ্যবান, সাহসী ও শক্তিশালী সন্তানের জননী হবে এবং সেই সন্তানরা জীবনের সব বাধা-বিপত্তি সহজেই লঙ্ঘন করতে সমর্থ হবে। এরপর অবশ্য কনের বাড়ীর আত্মীয়স্বজনরা 'খাদা' সহকারে পরম সম্মানে বর ও বরযাত্রী দলকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায়। তাদের আদরযত্নের ত্রুটি থাকে না, বিরাট ভোজেরও আয়োজন করা হয়। কনের বাড়ীতে একদিন অবস্থানের পর আবার তারা কনেকে নিয়ে নিজ গৃহের অভিমুখে সদলবলে যাত্রা করে। এবার কনেপক্ষ থেকে কয়েকজন মহিলা কনের সঙ্গী হিসেবে তাদের সঙ্গে যায়, এদের মধ্যে একজন বয়স্কা মহিলা কনেপক্ষের নেত্রী হিসেবে যান, তাকে বলা হয় 'থিউগ পা'। এই সময়ে কনের পিতামাতা তাদের সামর্থ অনুসারে নানা ধরণের জিনিষ যৌতুক হিসেবে দান করে,—তামা ও অন্যান্য ধাতু নির্মিত বাসনপত্র, মূল্যবান পাথরের ও সোনার গহনা, দুগ্ধবতী গাভী ও ঘোড়া ইত্যাদি যৌতুকগুলি কনেপক্ষের লোকেরা বহন করে নিয়ে যায়। বিদায়কালে কনের পিতামাতা ও গুরুজনরা 'খাদা' দিয়ে বরকনেকে আশীর্বাদ করেন। সকলে রওনা হয়ে যাওয়ার পরেও কনের বাড়ীতে অন্তত তিন দিন পর্যন্ত কোন 'তাসী-লামা' অর্থাৎ মঙ্গলদায়ী লামাকে এনে 'ইয়াং-খুগ' পুজো করান হয়, নবদম্পতির জীবন মঙ্গলময় হওয়ার প্রার্থনায়।

ঠিক একইভাবে সেই সময় পাত্রপক্ষের গৃহেও তাসীলামা এসে নানা পূজা অনুষ্ঠান করতে থাকে। গৃহের দরজা ও জানালা ফুল রঙ্গীন কাপড়ের ঝালর দিয়ে সুন্দর করে সাজান হয়। দরজার সামনে রাখা হয় জলপূর্ণ পাত্র ও জ্বালানি কাঠের স্তূপ। শীতের দেশ বলেই হয়তো জ্বালানি কাঠের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার প্রতীক হিসেবে সেগুলি রাখা হয়। কনে যখন গৃহে প্রবেশ করে তখন তার এক হাতে দেওয়া হয় একটি পাত্র ভর্তি মাখন ও ময়দা, অন্যহাতে দেওয়া হয় 'খাদা' দিয়ে বাঁধা একটি তীর। তাসীলামা তার মাথায় তুলে দেয় কাপড়ে জড়ান ধর্ম পুস্তকের বোঝা। গৃহে প্রবেশের পর কনেকে কোন একটি কাজ করতে অনুরোধ করা হয়। এই প্রথম কাজটি কি হবে তাও লামারা পূর্বেই গণনা করে ঠিক করে দেন। যেমন কাউকে বলা হয় জল আনতে, কাউকে আগুন ধরাতে, কাউকে বা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আনতে বলা হয়। শ্বশুর গৃহে এই প্রথম কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারলে তা পরম শুভ বলে মনে করা হয় এবং নববধু অত্যন্ত সুলক্ষণা বলে পরিগণিত হন। এবার পরিবারের কোন বয়স্ক সদস্য বধুকে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে তাকে খাদা দিয়ে বরণ করেন এবং বলেন 'আমা-খা-দ্রো'—ও মা, তোমাকে স্বাগত জানাই। কনের সামনে রাখা হয় একটি 'চোকসি' বা ছোট টেবিল ও তার উপরে নানা পাত্রে ময়দা. মাখন, মদ, 'ইয়াম' বা বিশেষ ধরণের মিষ্টি, তেল প্রভৃতি। পরিবারের কর্তা সেগুলি বংশের পূর্বপুরুষ ও গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে নববধূর হাতে অর্পণ করেন। বিবাহের অনুষ্ঠান এরপর শেষ হয় বিরাট ভোজ ও আমোদ আহ্লাদের মধ্য দিয়ে। অনেক সময় এই ভোজ তিন-চার দিন স্থায়ী হয়।

যদিও সিকিমীদের উপরোক্ত রীতিগুলি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত, কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিবাহ পদ্ধতিও অনেক পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে অথবা নিজেদের পছন্দ করা বিবাহের ক্ষেত্রে এত আনুষ্ঠানিক জটিলতা আর পালন করা হয় না। অন্যদিকে নানা উপজাতির সংমিশ্রণে এবং প্রথা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে এই প্রাচীন প্রথাগুলি ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

সৎকার

লেপচা-ভুটিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমাজে শবদেহ সৎকার করার পদ্ধতিও বড় বৈচিত্রপূর্ণ। মহাযান বৌদ্ধধর্মে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ব্যবধান স্বীকার করা

হয় না, মৃত্যু তাদের কাছে জীবনেরই অন্যতম অধ্যায়। তাই ভুটিয়া-লেপচা মহাযানী বৌদ্ধ সমাজে মৃত্যুকে শোকাবহ ও বেদনাময় না করার চেষ্টা করা হয়।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবদেহ সংকার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় না। মৃতের আত্মীয়রা প্রথমেই গোম্পায় লামাদের খবর দেয়। লামারা এসে শবদেহ উন্মুক্ত করে সেটিকে প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে বসিয়ে ছোট চৌকো কফিনে রেখে বন্ধ করে দেয়। তারপর সেই কফিনটি নানা রঙের ধর্মীয় প্রতীক চিহ্নিত কাপড় ও ধর্মীয় পতাকা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গৃহের উপাসনা ঘরে রাখে। মৃতদেহ কবে এবং কোন সময়ে সংকার করা হবে তাও এই লামারা গণনা করে দিনক্ষণ ঠিক করেন। দুই তিন দিন থেকে দশ-পনের দিন পর্যন্ত সেই কফিন বাড়ীতে থাকতে দেখা যায়। পুণ্যাত্মা লামা এবং রিমপোচে বা অবতার বলে খ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আরও দীর্ঘদিন শবদেহ ঐভাবে রেখে দেওয়া হয়। এদের বিশ্বাস, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা দেহের আকর্ষণ ছেড়ে চলে যায় না, প্রয়াত আত্মা জাগতিক স্তরের মধ্যেই বিচরণ করতে থাকে। তাই যতদিন শবদেহ বাড়ীতে থাকে ততদিন বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র সহকারে ও নানা উপাচারে লামারা নিরন্তর পূজা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান করতে থাকে। সেই শিঙ্গা, দামামা ও ঝাঁঝরের আওয়াজে চার পাশে অতি প্রাকৃত এক ভৌতিক আবহাওয়া গড়ে ওঠে। প্রতিদিন সেই মৃত ব্যক্তির খাদ্য ও পানীয় তার ঘরে রেখে দেওয়া হয় এবং সেগুলি পরে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। যে যত বেশী লামাকে এনে এই প্রার্থনা অনুষ্ঠান করাতে পারে, মৃত আত্মার ততই মঙ্গল হয় বলে এদের ধারণা। মৃতের আত্মীয় পরিজনদের প্রতিদিন এই লামাদের মদ মাংস ও আহার্য দিয়ে আপ্যায়িত করতে হয়। স্বভাবতই মৃত ব্যক্তির পরিবারকে এই সময়ে বিপুল ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তাই পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অর্থ দিয়ে ও অন্যান্যভাবে তাদের সাহায্য করে। এজন্য খাদ্য ও অর্থ নিয়ে মৃতের পরিবারে গিয়ে সমবেদনা জানানো একটি প্রথা।

এরপর লামাদের নির্ধারণ করা নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট ক্ষণে শোভাযাত্রা সহকারে শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে লামারা—শিঙা ও দামামা বাজাতে বাজাতে এবং মন্ত্র পাঠ করতে করতে চলে তাঁরা। শ্মশানে পৌঁছনোর পর প্রত্যেক শ্মশানযাত্রীকে সেখানে চা ও খাবার দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। লামারা সেখানেও পূজা অনুষ্ঠান করতে থাকে। এদের চিতা সাজানর পদ্ধতিও বিচিত্র। চিতা প্রস্তুত করার আগে মাটিতে আলপনার মত

নানা রঙ দিয়ে একটি চিত্র আঁকা হয়, এটিকে বলে স্বর্গদ্বার। শবদেহ চিতায় তোলার আগে মৃতকে শেষ খাদ্য অর্পণ করা হয়। এরপর প্রধান লামা আত্মার মুক্তি ঘটেছে বলে ঘোষণা করেন। তখন সেই কফিন সমেত শবদেহ চিতায় তোলা হয় এবং একজন লামা প্রথম অগ্নি স্পর্শ করান। চিতা প্রজ্জ্বলিত হয়। আত্মীয় স্বজনরা তাদের শেষ শ্রদ্ধার শেষ খাদ্য ছুঁড়ে দিতে থাকে সেই জ্বলন্ত চিতায়।

এরপর সাধারণত উনপঞ্চাশ দিন পরে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেদিনও নিমন্ত্রিত অতিথিরা খাদ্য ও অর্থ নিয়ে মৃতের বাড়ীতে যায় এবং মৃতের নিকটতম আত্মীয়কে খাদ্য দিয়ে সমবেদনা জানায়। খাদ্য ও পানীয় দিয়ে সমস্ত উপস্থিত অতিথিকে সাদর আপ্যায়ণ করা হয়। □

তিন

লেপচাদের রঙ্গীন জীবন

লেপচা উপজাতি সিকিমের আদি অধিবাসীরূপে স্বীকৃত এবং বলা হয়, তিব্বতীদের আগমনের প্রাক্কালে এরাই ছিল সিকিমের একমাত্র বসবাসকারী জাতি। লেপচারা নিজেদের 'রোঙ-পা' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। 'রোঙ' শব্দের অর্থ সুউচ্চ স্থানের অধিবাসী এবং এর অপর একটি অর্থে 'দাঁড়কাক' বোঝান হয়ে থাকে। অধিকাংশ আদিবাসীদের মধ্যে যেমন পশুপাখীদের নামে নিজেদের গোষ্ঠীভূক্ত করার (totem) রীতি দেখা যায়, লেপচারা তেমনি 'দাঁড়কাক' সম্প্রদায়ভুক্ত (Ravene Folk) বলে নিজেদের চিহ্নিত করে। তাই লেপচাদের নামকরণ করা বহু শব্দের আগে এই 'রোঙ' শব্দটি সংযোজিত রয়েছে দেখা যায়, যেমনি 'রোঙ-লী' (একটি স্থানের নাম) 'রোঙ-নীয়', 'রোঙ-নীত' (তিস্তা ও রঙ্গীত নদীর লেপচা নাম) ইত্যাদি। তিব্বতীদের কাছে লেপচারা 'মোন-রী' বা 'মোন-পা' নামে পরিচিত।

'লেপচা' এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায়। 'লেপচা' শব্দটিকে 'লাপ-চো' শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে করা হয়। 'লাপ-চো' শব্দের অর্থ স্তূপ বা পূজার বেদী। লেপচাদের মধ্যে পাথর বা মাটির বেদী তৈরী করে তার উপরে পশুপাখী বলি দিয়ে পূজা করার রীতি দেখা যায় এবং সেই থেকেই এই নামকরণ হওয়া সম্ভব। আবার ষ্টক-এর মতে 'লাপ-চা' শব্দ থেকেই লেপচা নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই 'লাপ-চা' শব্দের অর্থ দুর্বোধ্য ভাষা (Lap—Speech, cha—unintelligible)। প্রকৃতপক্ষে এই 'লাপ-চো' বা 'লাপ-চা' শব্দ নেপাল থেকে আগত নেওয়ার, লিম্বু ও অন্যান্য উপজাতিদের প্রভাবে 'লাপ-চে' শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের দ্বারা সেই 'লাপ-চে'র আধুনিকীকরণ ঘটে 'লেপচা' উচ্চারণে। তবে এখনও বস্তী বা গ্রামাঞ্চলের নেপালী ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে এই 'লাপ-চে' উচ্চারণেরই প্রচলন দেখা যায়। এখন

লেপচারাও নিজেদের লেপচা জাতি বলেই পরিচয় দেয় এবং তাদের ভাষাকেও বলা হয় লেপচা ভাষা।

লেপচাদের মধ্যে তিনটি বর্ণ বা সম্প্রদায় রয়েছে, যেমন—সেঙ-দেঙ-মো, লিঙ-সোম-মো ও হী-মো। এই তিনটি বর্ণ সম্মিলিত ভাবে 'কারথক্' গোষ্ঠীরূপে এবং পূর্বপুরুষ 'থেকং সালাঙ'-এর বংশধর বলে নিজেদের দাবী করে। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লেপচারা সেই অঞ্চল বা স্থানের নামানুসারে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করেছে, যেমন—রিন-চেন-পঙ এর টারগন-মো, ইলামের নাম-চে-মো, নাম-ফাঙ এর নাম-ফাঙ-মো ইত্যাদি। এই ধরণের প্রায় 39টি গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। তবে এদের মধ্যে জাতিভেদ ও বর্ণভেদের ধারণা আমাদের তথাকথিত জাতি ও বর্ণভেদের ধারণার অনুরূপ নয়। লেপচারা নিতান্তই নিজেদের এক একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীতে বিভাজনের উদ্দেশ্যে এইভাবে পার্থক্য করে থাকে। কিন্তু এই বর্ণভেদের কোন প্রভাব তাদের সামাজিক জীবনে কোন সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা ঘটায় না।

লেপচারা কোন্ সময়ে এবং কোথা থেকে এসে সিকিমে প্রথম বসবাস শুরু করে এ সম্পর্কে কোন সঠিক বা প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কোন কোন মতে, লেপচারা চীনা বা মোঙ্গলীয় জাতিরই শাখা এবং এরা তিব্বত থেকে আসাম হয়ে এখানে এসে আস্তানা পেতেছিল। ওয়াডেল-এর মতে, লেপচারা সম্ভবত ইন্দো-চীন শাখার সঙ্গে নাগা পাহাড়ের উপজাতিদের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এবং আসাম হয়ে সিকিমে প্রবেশ করে। সুদীর্ঘ একুশ বছর সিকিমে অবস্থান করার সময় হোয়াইট যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাতে তিনি এই লেপচাদের কখনই তিব্বতী শাখা বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে, লেপচাদের দৈহিক গঠন, মুখাকৃতি, আচার আচরণ ও ভাষার সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশের অধিবাসীদের প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে এবং এরা তাদের বংশোদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। অপর এক মতে, লেপচারা জাপান বা ব্রহ্মদেশ থেকে আসাম হয়ে সিকিমে এসেছে। এ সম্পর্কে *Imperial Gazetteer*-এ যে তথ্য জানা যায় তা অনেকটা নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে—'The Lepchas claim to be the autochthones of Sikhim proper. Their physical characteristics stamp them as being members of the Mongolian race, while certain peculiarities of language and religion render it probable that the tribe is a very ancient colony from southern

Tibet. The language they speak belongs to the Tibeto-Burman family. To this also belong the languages of Bhotia, Limbu, Murmi, Monger, Khembu and Newar.' এই সমস্ত মতামত সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে এবং এ বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন আছে।

লেপচাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপকথা প্রচলিত রয়েছে, সেগুলিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। সেঙ-দেঙ-মো গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনীটি পাওয়া যায় তাতে বলা হয়েছে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঠিক পিছনে অবস্থিত এক গোপন উপত্যকায় সাতজন মানবের এক পরিবার ছিল। এই সাতজন মানবকেই তারা পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির জন্মদাতা বলে মনে করে। সেই সাতজন মানবকেই সেঙ-দেঙ-মো গোষ্ঠীর লেপচারা তাদেরও স্রষ্টা বলে উল্লেখ করে থাকে।

লিঙ-সোম-মো গোষ্ঠীর লেপচাদের কাছে অপর একটি কাহিনী শোনা যায়। ইয়কসাম ও ডুবডী-র পিছনে, কাঞ্চনজঙ্ঘার মধ্যবর্তী তুষারাচ্ছন্ন পর্বত চূড়া পরিবেষ্টিত একটি প্রাকৃতিক জলাশয়ের উল্লেখ করে তারা বলে যে, ঐ স্থানে এক অশরীরী দেবী বাস করতো তার নাম 'মোন-দো-মীত'। আর কাছেই অপর একটি পর্বতচূড়ায় বাস করতো একটি বানর। একদিন সেই বানর কামাসক্ত হয়ে ঐ অশরীরী দেবীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয় এবং এই মিলনের ফলে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে, তার নাম 'ফাঙ-সঙ'। ফাঙ-সঙের পুত্র 'ফোদ-বাঙ-সঙ-পুটসো'র সঙ্গে বিবাহ হয় স্থানীয় পর্বতের এক দেবকন্যার। এই বিবাহের ফলস্বরূপ যে পুত্র জন্মলাভ করে সে 'আথেন' নামে পরিচিত ও স্বনামখ্যাত ছিল। লিঙ-সোম-মো গোষ্ঠীর লেপচারা এই 'আথেন'-এর উত্তরাধিকারী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়।

হী-মো গোষ্ঠীর লেপচাদের মধ্যে যে কাহিনীটি প্রচলিত রয়েছে তাতেও দেখা যায় যে এক অশরীরী দেবীর মাধ্যমেই তাদের উদ্ভব হয়েছে। এই দেবীর নাম 'কিউঙ-মো' এবং ইনি বাস করতেন 'লিগ-ডো' নামে এক পর্বত শৃঙ্গে অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক জলাশয়ে। কোন একদিন সেই দেবী জলাশয় থেকে উঠে আসেন, তাঁর অঙ্গাভরণ থেকে ঝরে পড়ে অসংখ্য মৎস। পরে সেই জলদেবীর সঙ্গে মিলন ঘটে পর্বতাশ্রিত এক দানবের। এই মিলনোদ্ভব সন্তানের নাম ছিল 'থিঙ-ফাঙ-ভু'। পরবর্তীকালে 'থিঙ-ফাঙ-ভু' সাত পুত্রের জন্ম দান করে এবং সেই সাতজন ভ্রাতাই 'হী-মো' গোষ্ঠীর প্রজনকরূপে গণ্য।

উত্তর সিকিমের গাড় জঙ্গু এবং মোন-ফু সম্প্রদায়ের লেপচাদের উৎপত্তির যে

কাহিনী পাওয়া যায় তা আরও চমকপ্রদ। এদের বিশ্বাস অনুসারে, এদের উৎপত্তি হয়েছে এক জোড়া নাগ আত্মা থেকে। এই দুই নাগ আত্মা অতি বৃহৎ আকারের সর্প-রূপে বাস করতো 'কামফেন-গ্যেন' পর্বত চূড়ায়। এই সর্প দম্পতির মিলনে বহু সর্পের জন্ম হয়। অবশেষে তারা সাতজন মানবাকৃতির দেবতার জন্মদান করে। সাত ভাই এর মধ্যে ছয় ভাই স্থানীয় জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত কন্দরে অশরীরী দেবতা রূপেই বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরে মানবদেহ ধারণ করে মানবের সংসর্গে এসে বাস করতে শুরু করে। কিন্তু ভাইদের সঙ্গে বিচ্ছেদের আগে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যান্য অশরীরী ভ্রাতাগণ পরস্পর অঙ্গীকার করে যে তারা পরস্পর চির-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। অশরীরী ভাইরা কখনও মানব জীবন হরণ না করার এবং বিপদে আপদে তাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রতিদানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপর ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে পূজার্ঘ দান করার প্রতিজ্ঞা করে। ভাইদের উদ্দেশ্যে তাই সে এক বিশাল পাথরের স্তূপ তৈরী করে নানা পশু, পাখী, মুরগী ইত্যাদি বলি দিয়ে প্রতি বছর পুজো দিতে থাকে। এখনও উত্তর সিকিমের জঙ্গু এলাকায় এইভাবে পাথরের স্তূপ তৈরী করে অশরীরী দেবতাদের উদ্দেশে পশুপাখী বলি দিয়ে পুজো করার রীতি পালিত হতে দেখা যায়।

এই কথা-কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতার পরিচয় কতটা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ থাকলেও, এ থেকে নতুন একটি চিন্তার সুযোগকে অস্বীকার করা যায় না। অশরীরী আত্মা, সরীসৃপ, মৎস, বানর প্রভৃতি থেকে লেপচাদের উৎপত্তির যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের আধুনিক বিবর্তনবাদের অস্পষ্ট ছায়া কি পরিলক্ষিত হয় না? অথবা জয়দেব বর্ণিত দশাবতার স্তোত্রের সেই কূর্ম, মীন, বরাহ প্রভৃতি অবতারের আভাস রয়েছে বলে কি ধারণা হয় না?

যদিও সমগ্র সিকিমে ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অংশে লেপচারা এখন বিস্তৃত ভাবে বসবাস করছে, কিন্তু উত্তর সিকিমের জঙ্গু এলাকাই প্রধানত লেপচা অধ্যুষিত অঞ্চল। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে লালিত এই লেপচারা এখনও পর্যন্ত আধুনিক সভ্যজগতের স্পর্শের অনেক দূরে রয়ে গেছে। তাদের চরিত্রেও তাই সভ্যজগতের কৃত্রিমতার কালো ছায়া তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অত্যন্ত শান্ত, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় এই লেপচাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমস্ত রকম বিরোধ ও দ্বন্দ্ব পরিহার করে চলা। সারল্য ও সততায় আজও তারা প্রাকৃতিক মানব। জেনারেল মেইনওয়ারিং, যিনি দীর্ঘকাল লেপচাদের মধ্যে অতিবাহিত করে

তাদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন, তিনিও লেপচাদের দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—এরা যেন সেই 'ইভ' ও 'আদমের' নিস্পাপ, নিষ্কলুষ সন্তান নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অভিশাপগ্রস্ত মানব সমাজ থেকে অনেক দূরের, অনেক উর্দ্ধের 'নন্দন' কানন থেকে সদ্য নেমে এসেছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সুগভীর আত্মীয়তা। প্রকৃতির মধ্যে তারা যেন এক সচেতন অস্তিত্বের অনুভূতি উপলব্ধি করে—প্রকৃতি তাই তাদের কাছে মানবিক সত্তায় বিরাজিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, প্রকৃতি যেন সেই 'হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া, শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে, পুলকে' এক নিগূঢ় জীবন রসে সিঞ্চিত প্রাণময় প্রতিবেশীর মতই লেপচাদের সঙ্গে হার্দিক আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

প্রকৃতির এই অসীম উদারতার মাঝে বাস করে বলে লেপচাদের ব্যক্তিগত জীবনের চাহিদাও অত্যন্ত সীমিত। যদিও তারা কিছু কিছু চাষবাস করে তবু তাদের খাদ্য শুধুমাত্র কৃষি নির্ভর নয়, জঙ্গল তাদের অনেক চাহিদা অনায়াসে পূরণ করে দেয়। আর আকাঙ্ক্ষা যাদের বশীভূত করতে পারে না, ভবিষ্যতের দুঃশ্চিন্তা থেকেও তারা মুক্ত। লেপচারা আজকের রসদ পেলেই খুসী, তাই তাদের বলা হয় 'মেন-থার-গ্যা' অর্থাৎ কালকের জন্য যারা চিন্তা করে না।

লেপচারা অত্যন্ত সুদক্ষ উদ্ভিদবিদ। আঞ্চলিক সমস্ত উদ্ভিদ তাদের পরিচিত এবং প্রায় সব রকম বৃক্ষলতাগুল্মের নাম লেপচা ভাষায় পাওয়া যায়। ভেষজ ঔষধ প্রস্তুত করতেও তারা খুব পারদর্শী। একইভাবে প্রাণীতত্ত্বেও তাদের সহজাত গভীর জ্ঞান লক্ষ্য করা যায়। পশুপাখী কীটপতঙ্গদের আচরণ দেখে তারা প্রাকৃতিক গতি-বিধি ও আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে।

লেপচাদের নিজস্ব ভাষা ও অক্ষর রয়েছে। লেপচা ভাষার সংস্কার সাধন করে পরিমার্জিত ও আধুনিকরূপ দিতে সাহায্য করেন সিকিমের প্রাক্তন তৃতীয় চো-গিয়াল চাগ-দর নামগিয়াল। দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত বহু উপকথা, গল্প ও কাহিনীতে লেপচা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ যা অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে খুবই কম দেখা যায়। সেই সাহিত্যেও এক জীবন্ত প্রকৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে ষ্টক বলেছেন, 'It will be noticed that a great many of these mountains and rivers are mentioned in the Lepcha mythology and appear in the creation myths, while they are also spoken of innumerous folk tales.'

সমাজ জীবনে ও পারিবারিক জীবনে লেপচা নারী এবং পুরুষ উভয়েই সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, মহিলারা পুরুষদের দ্বারা অবদমিত ও ও শোষিত নয়। আজকের দিনেও অন্যান্য সভ্যসমাজে মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে যে মেয়ে জন্মলাভ করলে পিতামাতা থেকে শুরু করে পরিবারের সকলেই একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। তারা বলে যে ছেলেরা বড় হলে তো মা-বাবাকে তেমন সাহায্য করে না, কিন্তু মেয়েদের মা-বাবার প্রতি অত্যন্ত দরদ ও কর্তব্যবোধ থাকে। এদের পারিবারিক জীবনের চিত্রটিও বড় শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল। সংসারে স্বামী স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলা-পুরুষ সব সদস্যই সমানভাবে কাজকর্ম করে। মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গে বাইরের কাজে ও চাষবাসের কাজে সাহায্য করে, অন্যদিকে পুরুষরাও মেয়েদের ঘরের কাজে সাহায্য করে থাকে। একটি পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারা আছে। প্রথম মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুম থেকে ওঠে। মুখ হাত ধুয়ে প্রথমে গৃহদেবতার মূর্তির সামনে জল রেখে দীপ জ্বেলে দেয়। সাতটি ছোট ছোট তামার খুরিতে করে জল দেয় এবং মাঝখানে একটি পাত্রে কিছু চাল রাখে। তারপর মহিলারা গৃহের সকলকে খাবার দেয়। সাধারণত তারা বিকেলে রান্না করা খাবার সকালে খেয়ে থাকে। বাড়ীর সকলের খাওয়া হলে গৃহের পালিত পশুপাখীদের খাবার দেয়। সকালেই দিনের খাবার খেয়ে নিয়ে সকলেই কাজের উদ্দেশে বাইরে বেরিয়ে যায়। শিকার করা, বনজঙ্গলে ঘুরে নানারকম গাছপালা, ফলমূল সংগ্রহ করা তাদের প্রধান জীবিকা। চাষবাসের কাজেও তারা আজকাল যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সারাদিনের কাজের শেষে বিকেলে আবার তারা ঘরে ফিরে আসে এবং গৃহস্থালির কাজকর্ম শুরু করে। গৃহে তৈরী 'চী' নামে একরকম মদ পান করে নারী পুরুষ সকলেই তাদের ক্লান্তি 'অপোনদন করে নেয়। অবশ্য মহিলারা যখন অন্তঃসত্ত্বা থাকে তখন তারা বাইরের কাজে যায় না। এই অবস্থায় মহিলাদের বিশেষ যত্নের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়।

অন্যান্য উপজাতিদের মত লেপচাদের মধ্যেও কতকগুলি সহজাত শিল্পবোধ রয়েছে এবং তারাও নানারকম কুটীর শিল্পের কাজ জানে। বাঁশ দিয়ে তারা তাদের যে বাসগৃহ বানায় সেগুলির মধ্যেও তাদের শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, ডালা, কুলো, বাক্স, টুপি ইত্যাদি নানারকম জিনিষপত্র তৈরী করে, তাঁত বোনে। সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতিও এদের যথেষ্ট আকর্ষণ রয়েছে। নারী

পুরুষ সমবেতভাবে নাচগান করে. বাঁশের বাঁশী ও ঢোলক ধরণের যন্ত্র বাজায়। নাচের সময় তারা গাছের ছোট ছোট ডাল হাতে নিয়ে নাচে। প্রত্যেক নাচ ও গানের সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে।

সাজসজ্জার প্রতি মহিলাদের যেস হজাত ঝোঁক থাকে লেপচা মহিলাদের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। লেপচা মহিলাদের কাপড় পরার একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে—দুই কাঁধের কাছে বাঁশের পিন দিয়ে অথবা গিঁট দিয়ে কাপড় পরে এবং মাথায় রুমালের আকারে এক টুকরো কাপড় পেছন দিকে টেনে বেঁধে রাখে। গহনা পরার সখও তাদের কম নয়, তারা নানারকম পাথরের ও পশুর নখ ও হাড় দিয়ে তৈরী মালা, কানের দুল, হাতের বালা ইত্যাদি পরে। কিন্তু লেপচা মহিলাদের কখনও নাকের গহনা পরতে দেখা যায় না, সম্ভবত নাকের গড়ন চ্যাপ্টা বলেই হয়তো নাকের সৌন্দর্যের প্রতি তাদের নজর নেই। পুরুষরা ঘরের তাঁতে বোনা যে পোষাকটি পরে তাকে বলা হয় 'থারা'। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরাও হাতে বালা ও কানে মাকড়ি জাতীয় গহনা পরে, মাথায় থাকে টুপি। লেপচাদের যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে তিব্বতীদের আসার আগে লেপচারা একজন নেতার নেতৃত্বাধীনে বাস করতো। এই নেতাকে বলা হ'তো 'পু-নু'—ইনি প্রায় রাজার মতই ক্ষমতা ও পদমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। সর্বশেষ 'পু-নু' ছিলেন 'টুভ্-আথক' এবং এর সঙ্গেই রাজপদের অবসান ঘটে। পরবর্তীকালে লেপচারা নিজেদের মধ্য থেকে একজন বর্ষীয়ান ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকে তাদের মণ্ডল বা প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করতে শুরু করে। তিব্বতীদের আগমনের পরে এবং রাজ্য স্থাপনের ফলে লেপচারা স্বাভাবিক কারণেই তাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠে এবং রাজ্যের অন্যতম নাগরিক হিসেবে গণ্য হয়।

বহুপূর্বে কিছু ফিনিশ ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয় মিশনারী লেপচাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটানর চেষ্টা করে। কিন্তু তুলনামূলক সংখ্যায় তা নিতান্তই নগণ্য। উত্তর সিকিমের লেপচা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি আজও সেই আদিম যুগের আদিম ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এমনকি তিব্বতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাব অত্যন্ত গভীর হলেও, লেপচাদের প্রাক বৌদ্ধ যুগের ধর্ম, বিশ্বাস, প্রথা ও রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায় নি। বরং বলা যায়, তিব্বতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে লেপচাদের প্রাকৃতিক 'বোন' ধর্ম, তাদের আচার-আচরণ ও রীতিনীতির গভীর সংমিশ্রণের ফলে সিকিমে মহাযান বৌদ্ধধর্ম আরও জটিলতর এক রূপ পরিগ্রহ

করেছে। লেপচাদের ভূত প্রেত, পিশাচ, দানব প্রভৃতি যেমন বৌদ্ধধর্মের অবতার ও বোধিসত্বগণের সঙ্গে সহাবস্থান করছে, অপরদিকে তেমনি তাদের 'বুন-থিং' বা ওঝাদের প্রাকৃতিক চিকিৎসা ও ভেষজ ঔষধ, তাদের কুহক, সম্মোহন ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাও বৌদ্ধ লামাদের আচরণ বিধিতে প্রগাঢ়ভাবে মিশে গেছে।

শুধু ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, লেপচা ও তিব্বতীদের মধ্যে অবাধ বৈবাহিক সম্পর্ক বিস্তারের ফলে সিকিমে এক নবতর জাতির উদ্ভব হয়েছে এবং ভুটিয়া বা তিব্বতী এবং লেপচাদের মধ্যে পার্থক্যের ক্ষীণ রেখাটি ক্রমশই ক্ষীণতর হয়ে আসছে। লেপচা-ভুটিয়া মিলনোদ্ভূত এই নতুন জাতি তাই এখন 'সিকিমী' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। □

চার

ধর্মরাজ্য

সিকিমের দ্বিতীয় সংখ্যা-গরিষ্ঠ জাতি তিব্বতী বা ভুটিয়া। এরা এসেছে মূলতঃ পূর্ব তিব্বতের 'খাস' অঞ্চল থেকে। ভুটিয়া বলতে সাধারণত ভুটানের অধিবাসী বলে ধারণা হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভুটান ও সিকিমের এই ভুটিয়া অধিবাসীরা তিব্বতের একই অঞ্চল থেকে সম্প্রসারিত হয়ে প্রায় একই সময়ে ভুটানে ও সিকিমে বসবাস করতে শুরু করে। উভয় দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাগত সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, যেটুকু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা নিতান্তই আঞ্চলিক প্রভাবের জন্য।

প্রাচীনকালে তিব্বতকে ভারতীয় সাহিত্যে 'ভোটদেশ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই ভোটদেশের অধিবাসীদের 'ভৌট্ট' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভুটানের প্রাচীন নাম ছিল 'ভোটাঙ্গ' বা 'ভোটান্ত'। এই 'ভৌট্ট' থেকেই ভুটিয়া এবং 'ভোটান্ত' থেকেই ভুটান শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। তিব্বতী ভাষায় তিব্বতকে বলা হয় 'পো' এবং তিব্বতীদের 'পো-পা', কিন্তু লেখা হয় 'বোদ' এবং 'বোদ-পা'। এই বিষয়ে তিব্বতী-চর্চা বিশারদ গুসেপ তুচ্চি লিখেছেন, 'The indigenous name for Tibet is P' O" [spelt Böd] or P'Oyül.' কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই তিব্বতী 'বোদ' শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত 'ভোট' শব্দের মিল রয়েছে এবং তাদের অনুমান এই 'বোদ' শব্দ 'ভৌত' শব্দের উচ্চারণ বিকৃতি মাত্র।

তিব্বতীরাও মিশ্র জাতি। প্রধানত তারা তিব্বত-বর্মা ও তুর্ক মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত এবং এর সঙ্গে অস্ট্রোনেশিয়ান রক্তধারাও সংমিশ্রিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মিশ্রণেও পারস্পরিক প্রভাবে জাতিগত পার্থক্য লুপ্ত হয়ে সমজাতি বা সমধর্মবিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে। এদের দৈহিক গঠন অত্যন্ত ঋজু ও বলিষ্ঠ, মুখাকৃতি মোঙ্গলীয় এবং বর্ণ পীতাভ শ্বেত। তিব্বতের বিভিন্ন

অঞ্চলের কথ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও রাজধানী লাসার ভাষাই তিব্বতী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। ব্যবসা, পশুপালন ও শিল্পকাজ এদের প্রধান জীবিকা। সম্ভবত তুষারাঞ্চলের অধিবাসী বলেই হয়তো কৃষিকাজে তুলনামূলকভাবে এরা কম আগ্রহী। তবে বর্তমানে সিকিমের এই ভুটিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় এলাচের চাষ অন্যতম প্রধান জীবিকা।

তিব্বতীদের হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে আসার কতকগুলি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ ছিল। দশম-একাদশ শতাব্দীতে গৃহযুদ্ধের ফলস্বরূপ তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট বড় নানা অমাত্য পরিবার অথবা গোষ্ঠী-প্রধানদের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমাত্য শক্তির নিত্য দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী দুই বৃহৎ রাষ্ট্র চীন ও মোঙ্গল বার বার তিব্বতে হানা দিয়ে বিভিন্ন অংশ দখল করে নেয়। একদিকে যখন এই রাজনৈতিক অস্থিরতা চলেছে ঠিক তখনই তিব্বতের ধর্ম জীবনেও এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। দশম-একাদশ শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টির সূচনা হয়। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে 'গেলুক-পা' সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটে এবং তারা একাধারে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষমতা অধিকার করে নিয়ে 'লামাতন্ত্র' বা Grand Hierarchy-র সূচনা করে। অনিবার্যভাবেই ক্ষুব্ধ তিব্বতীদের, বিশেষত যারা আদি 'ঞিঙ-মা-পা' সম্প্রদায়ভুক্ত, নিজস্ব প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য নতুন স্থানের সন্ধান করা তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। সুতরাং তারা ক্রমশ তিব্বত থেকে সরে আসতে আরম্ভ করে এবং দক্ষিণে 'চুম্বী' উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 'চুম্বী' থেকে তাদের এক অংশ ভুটানের 'হা' অঞ্চলের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে যায়, অপর অংশ সিকিমের দিকে অগ্রসর হয়ে আসে।

তিব্বতীরা যখন সিকিমে এসে বসবাস করতে শুরু করে তখন সিকিমের অধিবাসী ছিল একমাত্র 'রোঙ' বা লেপচারা। লেপচাদের স্বভাবসুলভ শান্তিপ্রিয়তা ও কলহ বিমুখতার জন্য তারা প্রায় বিনা বাধায় তিব্বতীদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তাছাড়া প্রকৃতির সন্তান লেপচাদের তুলনায় তিব্বতীরা তখন অনেক অভিজাত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন জাতি। লেপচাদের সঙ্গে তিব্বতীদের চারিত্রিক গঠন, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাপন পদ্ধতি প্রভৃতিতেও প্রায় আকাশ পাতাল ব্যবধান ছিল। তিব্বতীরা ছিল বলবান ও সতেজ, লেপচারা নিরীহ ও দুর্বল ; তিব্বতীরা সম্পদ সচেতন, লেপচারা বিষয়ের প্রতি উদাসীন ; তিব্বতীরা কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে এক সুসংহত, সুশৃঙ্খল জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল,

কিন্তু তিব্বতীদের আসার আগে পর্যন্ত লেপচারা নিতান্তই আদিম প্রাকৃতিক ধর্ম (যা 'বোন' ধর্ম নামে পরিচিত অর্থাৎ ভৌতিক আত্মা, অপদেবতা, প্রাকৃতিক দেবতা প্রভৃতির পূজায় বিশ্বাসী) এবং প্রাকৃতিক আইনের অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হত। সুতরাং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে যে প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে, তিব্বতীরা লেপচাদের কাছ থেকে তেমন কোনই বাধা পেল না এবং প্রভাব বিস্তার করতে ও প্রভুত্ব করতেও তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হ'ল না। তিব্বতীদের ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ ও অবাধে জমি দখল করে নেওয়াটা লেপচারা হয়তো একান্ত ঔদাসীন্যের বশেই প্রতিহত করার কোন চেষ্টা করে নি। তাই তিব্বতীরা বিনা সংগ্রামে, বিনা প্রতিবাদে এক নতুন দেশের অধিকর্তা হয়ে উঠলো। লেপচাদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা তো হ'লই না বরং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা উভয় জাতির মধ্যে এক চিরস্থায়ী বন্ধন গড়ে উঠলো। সেই বন্ধন এখনও অটুট।

তিব্বতীদের সিকিম আগমনের বিষয়ে যে কাহিনীটি পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও কাহিনীটি বহুল প্রচলিত এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে ইতিহাসের মতই বিশ্বস্ত। কাহিনীটিতে তিব্বতীরা কিভাবে সিকিমে এসে রাজ্যস্থাপন করে তার সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে।

পূর্ব তিব্বতের 'খাম' প্রদেশের 'মী-নীয়াক' এর রাজারা লাসার প্রধান রাজপরিবার বংশের আত্মীয় বলে পরিচিত ছিল। এই স্থানের পঞ্চবিংশতিতম রাজা 'গুরু তাসী' অত্যন্ত সৎ এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তিব্বতে বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিদর্শন করে যখন লাসাতে জো-ভো রিমপোচে শাক্যমুনির গোম্পা দর্শন করতে যান, তখন সেখানে দৈববাণী শুনতে পান যে ভাবী কালে তাঁর বংশধরগণ তিব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত 'দেমাজং' (বর্তমান সিকিম) নামক স্থানের রাজপদ লাভ করবেন। দৈবাদেশ পেয়ে পুলকিত গুরু তাসী তাঁর পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে সেই অজ্ঞাত দেমাজং-এর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। প্রথমে তারা 'সা-ক্য' নামক স্থানে পৌঁছায়। সেই সময় সা-ক্যর শাসনকর্তা একটি সুবিশাল বৌদ্ধ-গোম্পা নির্মাণ করাতে ব্যপৃত ছিলেন। গুরু তাসীর জ্যেষ্ঠপুত্র এতই শক্তিধর ছিল যে সে ঐ নির্মিয়মান গোম্পাটির সুবৃহৎ চারটি স্তম্ভ একা হাতে উঠিয়ে সোজা করে স্থাপন করে দেয় যা কিনা হাজার হাজার লোকের সমবেত চেষ্টাতেই সম্ভবপর ছিল। তার এই অতুলনীয় শক্তির পরিচয় পেয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা তার নাম দেয় 'জো-খ্যে-বুমসা' অর্থাৎ যে লক্ষ মানুষের সমান শক্তিমান। সা-ক্যর শাসনকর্তা অত্যন্ত প্রীত হয়ে তার কন্যা 'গুরু-

মো'-র সঙ্গে খ্যে-বুমসার বিবাহ দেন। এই খ্যে-বুমসাই সিকিমে তিব্বতী অনুপ্রবেশের প্রথম ও প্রধান নায়করূপে স্বীকৃত।

বিবাহের কিছুদিন পরে গুরু তাসী আবার সপরিবারে যাত্রা শুরু করলেন। এবারের গন্তব্যস্থল হ'ল 'পা-সী'। পা-সীতে অবস্থানকালেও তারা একটি বৌদ্ধ গোম্পা তৈরী করেন এবং ঐ গোম্পাতে প্রায় চারশত লামার বাসের উপযুক্ত স্থান করা হয়। গুরু তাসী তার একজন পুত্রের উপরে ঐ গোম্পাটির দায়িত্ব দিয়ে আবার তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। এরপর তারা পৌঁছলেন 'ফা-রী' নামক স্থানে। ফা-রীতে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-গোম্পা অবস্থিত। 'সামত্রুব-লা-খাঙ' গুরু তাসীর পুত্রদের দ্বারাই নির্মিত বলে জানা যায়। কিন্তু ফা-রীতে থাকার সময় গুরু তাসীর মৃত্যু হয়। তাই পিতার মৃত্যুর পর ফা-রী থেকে বিদায় নিয়ে খ্যে-বুমসার নেতৃত্বে তাদের দল এগিয়ে চললো অভীষ্ট পথে। অবশেষে তারা 'চুম্বী' উপত্যকায় এসে উপস্থিত হ'ল। চুম্বীতে আসার পরে খ্যে-বুমসার অপর তিন ভাই সে-সিং, সেন্-দঙ ও কার-সঙ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভুটানের 'হা' অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়, কিন্তু খ্যে-বুমসা চুম্বীতেই বাস করতে মনস্থ করে।

চুম্বীতে বাস করার সময় ভুটানের একজন প্রবল পরাক্রান্ত বীর 'নাওয়াং-পালবার' খ্যে-বুমসাকে শক্তি পরীক্ষার জন্য আহ্বান জানায়। শক্তি পরীক্ষার প্রথম শর্ত ছিল যে, তিন পাখী (প্রায় 15 কেজি) সরষে দানা থেকে দুই হাতের নিষ্পেষণের দ্বারা তেল নিষ্কাষণ করতে হবে। খ্যে-বুমসার কাছে এই শর্ত নিতান্তই গুরুত্বহীন ছিল, সে অতি সহজে ও অনায়াসে সমস্ত সরষেদানা নিষ্পিষ্ট করে তার থেকে সম্পূর্ণ তেল নিষ্কাশিত করে দেয়। কিন্তু নাওয়াং-পালবার সরষেদানাগুলি কেবলমাত্র চূর্ণ করতে সমর্থ হলেও একবিন্দু তেলও নিষ্ক্রান্ত করতে পারে না। দ্বিতীয় শর্তে ছিল যে, অপরের মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে নিজ হাত মুক্ত করে আনতে হবে। এবারও খ্যে-বুমসা অক্লেশে নাওয়াং-পালবারের মুষ্টি থেকে আপন হাত মুক্ত করে নেয়। কিন্তু খ্যে-বুমসার বজ্রমুষ্টি থেকে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে গেলে নাওয়াং-পালবারের সম্পূর্ণ হাতটিই কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইভাবে শক্তি পরীক্ষায় ভুটানের বীরের লজ্জাকর পরাজয়ে এবং খ্যে-বুমসার অমিত শক্তির পরিচয় পেয়ে স্থানীয় অধিবাসীগণ তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। খ্যে-বুমসা চুম্বীতে প্রভুত্ব বিস্তার করে নির্বিঘ্নে বাস করতে থাকে।

কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কোন সন্তান সন্ততি না হওয়ার জন্য খ্যে-বুমসার মনে শান্তি ছিল না। এই সময়ে সে হঠাৎ সন্ধান পায় যে দেমাজং-এ 'মোন-রী' (লেপচা)

লামা ওঝা

কাঞ্চনজঙ্ঘা

চো-গিয়াল পল-দেন-থন-ড়ুপের শবযাত্রা। নাম-গিয়াল রাজবংশেরও শেষযাত্রা।

সিকিমের দুষ্প্রাপ্য অর্কিড—'লেডিস স্লীপার'

রডড্রেনডন গুচ্ছ

পেমা ইয়াংসি গোম্পার অভ্যন্তর

গ্যাংটকে ঞিঙ-মা-পা সম্প্রদায়ের 'ছো-তেন'
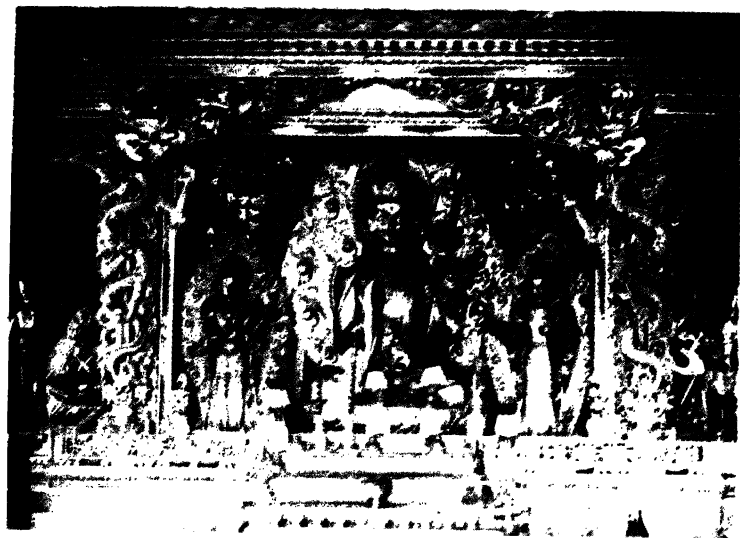
উপাজাতিদের প্রধান 'থেকং-টেক্' তার অলৌকিক শক্তির দ্বারা সন্তান লাভে সহায়তা করতে পারেন। খ্যে-বুমসা সেই 'মোন-রী' প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করে এবং কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে অচিরে দেমাজং-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। তারা ইয়াক-লা, পেন-লঙ ও সাতা-লা গিরিপথের মধ্য দিয়ে এসে দেমাজং-এর 'রংক-পো'তে উপস্থিত হয়। সেখানে একজন বৃদ্ধ জমি চাষ করছিল। খ্যে-বুমসার অনুচররা তার কাছে থেকং-টেক্-এর বিষয়ে অনুসন্ধান করলে বৃদ্ধ কোন উত্তর না দিয়ে দূরে একটি বাঁশের তৈরী কুটীরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাদেরকে সেখানে যেতে ইঙ্গিত করে। খ্যে-বুমসা তার সহচরগণ সহ সেই কুটীরের সামনে পৌঁছে বিস্মিত হয়ে দেখলো যে ঐ বৃদ্ধ লোকটি তাদের অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে এবং বিচিত্র পোষাক পরে একটি পাথরের স্তূপের উপরে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। তার মাথায় পাখীর পালকের মুকুট, গলায় নানারকম পাথর ও পশুর নখের মালা আর তার চারপাশে কিছু মোন-রী নারী পুরুষ ঘিরে রয়েছে! খ্যে-বুমসা বুঝতে পারল যে এই সেই থেকং-টেক। সে তখন যথাযথ সম্মানে বৃদ্ধকে অভিবাদন করে ও বহুবিধ মূল্যবান উপহার রেখে তাদের আগমণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো। বৃদ্ধ থেকং-টেকও তাদের সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে ঘরে এনে বসাল। বৃদ্ধের স্ত্রী 'নেওকং-নেগল' বহুরকম পশু ও পাখীর মাংসের খাদ্য প্রস্তুত করে অতিথিদের পরম আদরের সঙ্গে আপ্যায়িত করলো। এরপর থেকং-টেক তার যাদু-বিদ্যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ গণনা করে খ্যে-বুমসাকে আশ্বাস দিয়ে বলে যে শীঘ্রই সে তিন পুত্রের জনক হবে এবং উত্তরকালে তার বংশধরগণ এই দেমাজং-এর রাজ সিংহাসন লাভ করবে। খ্যে-বুমসা অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে চুম্বীতে ফিরে আসে।

চুম্বীতে ফিরে আসার পর সত্যই খ্যে-বুমসার পর পর তিন পুত্র জন্মলাভ করে। খ্যে-বুমসা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশে আবার দেমাজং-এ আসে। এবার তারা চো-লা গিরিপথের মধ্য দিয়ে এসে 'কাবি—রিংচোম' নামক স্থানে থেকং-টেক ও নেওকং-নেগল-এর সঙ্গে মিলিত হয়। খ্যে-বুমসা ও থেকং-টেক—দুই জাতির দুই প্রতিনিধি পরস্পর চির বন্ধুত্ব রক্ষা করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। (উত্তর সিকিমের ফোদং-এর কাছে সেই জায়গাটি এখনও লেপচা-ভুটিয়া জাতির বন্ধুত্বের অঙ্গীকারের স্মারক হিসেবে অতি পবিত্রস্থান রূপে সংরক্ষিত রয়েছে)। খ্যে-বুমসা আবার চুম্বীতে ফিরে যায়।

পুত্ররা বড় হলে, খ্যে-বুমসা একদিন তাদের ভাবী জীবনের আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। জ্যেষ্ঠপুত্র জানালো, সে তার প্রতিবেশী ও বন্ধুদের প্রতারণা করে

ব্যবসা করবে। মধ্যম পুত্র বললো, তার কৃষিকাজ করে জীবিকার্জন করারই ইচ্ছে। কনিষ্ঠ উত্তর দিল, জনগণের নেতা হওয়াই তার একমাত্র বাসনা। পুত্রদের অভিলাষ অনুসারে খ্যে-বুমসা তাদের নামকরণ করলো ঃ জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম 'খ্যা-বো-রাব' অর্থাৎ প্রতারক, মধ্যম পুত্র 'লাঙ-মো-রাব' বা কৃষক এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'মিপন-রাব' অর্থাৎ জননেতা। ভবিষ্যতে এই 'মিপন-রাব' সত্যই তিব্বতী ঔপনিবেশিকদের নেতা হয়ে উঠেছিল এবং তার ব্যক্তিত্ব ও সদগুণের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। মিপন-রাবের সঙ্গে সো-স্ক্যর রাজপরিবারের এক রাজকন্যার বিবাহ হয় ও তাদের চার পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। মিপন-রাবের চার পুত্রই তিব্বতী পঞ্জিকা অনুসারে অতি পবিত্রদিনে জন্মলাভ করে, তাই তাদের অতি পুণ্যাত্মা বলে মনে করা হতো। সিকিমে যে প্রধান চারটি তিব্বতী বা ভুটিয়া বংশ 'সোঙ-দ্রুস-রু-জি' নামে খ্যাত তারা উক্ত চার ভাই-এর উত্তরাধিকারী বলে নিজেদের দাবী করে। সিকিমের 'নামগিয়াল' রাজবংশের প্রথম রাজা 'ফুন্ত-সো' এই মিপন-রাবের পঞ্চম উত্তরপুরুষ।

খ্যে-বুমসা চুম্বীতে স্থায়ী হলেও তার মৃত্যুর পর তার পুত্ররা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ ক্রমশ পার্বত্য বাধা অতিক্রম করে দেমাজং তথা সিকিমে সম্প্রসারিত হয়ে আসতে থাকে। এইভাবে সিকিম যখন ধীরে ধীরে তিব্বতীদের উপনিবেশে পরিণত হয়ে ওঠে, তখন স্বাভাবিক কারণেই তাকে এক সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রীয় রূপ দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাছাড়া লেপচাদের প্রাকৃতিক ধর্ম ও প্রাকৃতিক আইনের অভ্যস্ততা থেকে তিব্বতীদের নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতির পক্ষপুটে নিয়ে আসাও রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সুতরাং পরবর্তী অধ্যায়ে বৌদ্ধ লামাদের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কাহিনীর দ্বিতীয়ার্ধে তাই তিব্বতী লামা সম্প্রদায়ের আগমণ ও ধর্মরাজ্য স্থাপনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

প্রায় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে তিব্বতীরা ধীরে ধীরে দক্ষিণে বিস্তৃত হতে শুরু করে এবং সিকিম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে উপনিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সিকিম রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে নি। শোনা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিব্বতের সা-স্ক্য অঞ্চল থেকে তিনজন প্রখ্যাত লামা হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিপথ দিয়ে এসে পশ্চিম সিকিমের 'ইয়ুকসাম নরবু-গাঙ' নামক স্থানে মিলিত হন! এঁরা পূর্বঘোষিত দৈব নির্দেশ অনুসারেই নাকি এই স্থানে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। তিনজন লামার নাম— লাচেন-চেমবো, কারতক কুন্তো ও নাদাক-সেমপো। এদের মধ্যে প্রধান লাচেন-

চেমবোর নামই সিকিমের লামাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। লাচেন-চেমবো ছিলেন সা-স্ক্যর বৌদ্ধমঠের প্রধান লামার আত্মীয় এবং তিনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে পরিচিত ছিলেন। প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে লাচেন-চেমবো তাঁর অলৌকিক শক্তির সাহায্যে হিমালয়ের সুউচ্চ কাব্রু শৃঙ্গ (2400 ফুট) অতিক্রম করে উড়ে এসে সিকিমের মাটী স্পর্শ করেন এবং অপর দুইজন লামা বিভিন্ন দিক থেকে এসে তাঁর সঙ্গে ইয়ক-সামে মিলিত হ'ন। 'ইয়ক-সাম' শব্দের অর্থ তিনজন মহামানবের মিলন স্থান। পরবর্তীকালে ঐ ঐতিহাসিক স্থানটিকে সেজন্য 'ইয়ক-সাম' নামে চিহ্নিত করা হয়।

তিনজন লামা পরস্পর পরিচয়ের পর তাঁদের উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রথমে অপর দুইজন লামা, কারতক-কুন্তো ও নাদাক-সেমপো, উভয়েই রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতা হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন এবং তাদের দাবীর সমর্থনে তারা উভয়েই রাজবংশোদ্ভূত বলে জানান। কিন্তু লাচেন-চেমবো অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এই নেতা নির্বাচনের দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সমাধান করেন। তিনি জানালেন যে. প্রায় নয় শত বছর আগেই গুরু পদ্মসম্ভব এই অজ্ঞাত দেমাজং-এর ভাবী রাজার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এবং সেই অনুসারে সা-স্ক্য রাজ-বংশের কোন উত্তরপুরুষ এখানকার 'ধর্মরাজা' রূপে সিংহাসনে আরোহণ করবেন। নিজের বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য লাচেন-চেমবো বিভিন্ন প্রমাণাদি দেখিয়ে সেই ভাবী রাজার সন্ধান করতে ব্যস্ত হলেন এবং তার সম্বন্ধে নানা সংকেত চিহ্ন দিয়ে স্থানীয় একদল প্রতিনিধিকে অনুসন্ধান করতে পাঠালেন।

সেই প্রতিনিধিদল চতুর্দিকে খোঁজ করে অবশেষে পূর্ব সিকিমের 'গাস্তোক'-এ পৌঁছে এক ব্যক্তির দেখা পেল যার সঙ্গে লাচেন-চেমবো প্রদত্ত সংকেত চিহ্নগুলির অবিকল সাদৃশ্য রয়েছে। সেই ব্যক্তি তখন তার গৃহপালিত গাভীগুলির দুগ্ধ দোহন করছিল। প্রতিনিধিগণ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ও জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'ল যে ইনিই সেই দৈব নির্ধারিত ভাবী ধর্মরাজা। তখন তারা তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো এবং লামা লাচেন-চেমবোর পক্ষ থেকে তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালো। ঐ ব্যক্তিই 'ফুন্ত-সো',—খ্যে-বুমসার বংশধর। প্রসিদ্ধ লামাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ফুন্ত-সো সানন্দে সদলবলে ইয়কসামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ইয়কসামে পৌঁছবার পর লামারা সসম্মানে ফুন্ত-সোকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। এরপর যথাবিহিত নিয়মে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ ফুন্ত-সোর অভিষেক করে

তাকে 'চো-গিয়াল' অর্থাৎ ধর্মরাজা হিসেবে ধর্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার উভয় দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ভার দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হ'ল। প্রধান লামা লাচেন-চেমবো তার নিজস্ব পদবী 'নাম-গে' এই রাজবংশের পদবী হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে সম্মানিত করেন। এইভাবে সিকিমে 'নাম-গিয়াল' রাজবংশের যাত্রা শুরু হয়। এই অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিব্বতী পঞ্জিকা অনুসারে 'চ্যুত' বৎসরে অর্থাৎ ইংরেজীর 1642 খ্রীষ্টাব্দে। 1975 সালে ভারত-ভুক্তির সময় পর্যন্ত এই নাম-গিয়াল বংশের দ্বাদশ চো-গিয়াল সিকিমে রাজত্ব করে গেছেন।

এই অভিষেকের স্মারক হিসেবে একটি 'ছো-তেন' বা স্তুপ নির্মাণ করা হয়। পশ্চিম সিকিমের ইয়কসামে আজও সেই 'ছো-তেন' ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করছে। □

পাঁচ

নেপালী সংখ্যা গরিষ্ঠতার ইতিহাস

নেপালীরাই বর্তমানে সিকিমের সংখ্যা গরিষ্ঠ অধিবাসী। এখানে সাম্প্রতিক 1981 আদম সুমারির হিসাব অনুযায়ী মোট 3 লক্ষ 16 হাজার জনসংখ্যার মধ্যে নেপালীর সংখ্যা 2 লক্ষ 37 হাজার। হিসাব বর্হিভূত আরও প্রায় 37 হাজার নেপালী সিকিমে বসবাস করে, যাদের সিকিম তথা ভারতীয় নাগরিকত্ব নেই। প্রধানত কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যেই এরা সিকিমে এসেছে, কিন্তু এখনো নেপালের সঙ্গে তারা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নি। নেপালের বিভিন্ন অধিবাসীদের সাধারণভাবে নেপালী বলে অভিহিত করা হলেও এদের মধ্যে নানা উপজাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী রয়েছে—যেমন : নেওয়ার, রাই, লিম্বু, গুরুং, মঙ্গার, তামাং, শেরপা, থারু, সুনুয়ার ইত্যাদি। তবে বর্তমানে রাজনৈতিক ও ভাষাগত ঐক্যের ফলে এরা সবাই সমজাতিতে পরিণত হয়েছে এবং 'নেপালী' বলেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে।

নেপালীদের মধ্যে 'নেওয়ার' জাতিরাই সর্বাধিক উচ্চ-সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে গণ্য ছিল। এরা নেপালের কাঠমাণ্ডু অঞ্চলের আদি অধিবাসী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এরাই ছিল ঐ অঞ্চলের শাসক গোষ্ঠী। নেওয়ারদের দৈহিক গঠন, বিস্তৃত চোখ ও উন্নত নাশা দেখে অনুমান করা হয় যে, এদের মধ্যে আর্য রক্তধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং ভারতীয় ও মোঙ্গলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ধর্ম ও ভাষাগত সাদৃশ্যও তার অন্যতম প্রমাণ। কোন কোন মতে, এই নেওয়াররা পশ্চিম ভারতের 'নায়ার' জাতিদেরই শাখা। এই অনুমানের সপক্ষে আরও একটি প্রমাণ যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। কাঠমাণ্ডুতে 'তলেজু ভবানী' দেবীর একটি মন্দির আছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশ অঞ্চলেও 'তুলজা ভবানী' নামে দেবী মূর্তির পূজার প্রচলন রয়েছে। সুতরাং নায়ার থেকে নেওয়ার এবং তুলজা থেকে তলেজু—আঞ্চলিক প্রভাবে এই উচ্চারণের পার্থক্য ঘটা সম্ভব। নেওয়ারী ভাষা, সংস্কৃত ভাষা থেকেই

উৎপন্ন এবং দেবনাগরী অক্ষরে তা লিখিত হয়, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'দেবাক্ষর'। নেওয়ারদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক শিব-মার্গী বা শিবের উপাসক। তবে সামান্য সংখ্যক বুদ্ধ-মার্গী বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও এদের মধ্যে রয়েছে। হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে বর্ণভেদ প্রথা এদের মধ্যে সমানভাবেই প্রচলিত। প্রধানত তিনটি বর্ণ এদের মধ্যে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (ছেত্রী) ও বৈশ্য।

নেওয়ার ছাড়া নেপালের অন্যান্য উপজাতিগুলি সবই প্রধানত টিবেটো-মোঙ্গলীয় রক্তধারা থেকে উদ্ভূত। নেপালের অরুণ ও তোম্বার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা 'রাই' বা 'খম্বু' জাতি হিসেবে পরিচিত। এদের দৈহিক গঠন, মুখের আকৃতি ও চোখের ভাঁজে মোঙ্গলীয় রক্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই 'রাই' উপজাতিকেই মহাভারতে বর্ণিত কিরাতি বা কীচক জাতি বলে মনে করা হয়। 'রাই' শব্দের অর্থ প্রধান,—গ্রাম বা অঞ্চলের মুখ্য বা প্রধান ব্যক্তিকেই 'রাই' বলে সম্বোধন করার রীতি ছিল। পরবর্তীকালে এই উপজাতির সকলেই 'রাই' শব্দটি পদবী হিসেবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। বিশেষত, নেপালে গোর্খা অভ্যুত্থানের সময় 'রাই'দের প্রভাব ও প্রতিপত্তির জন্য অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে তাদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি হয় এবং সকলেই তাদের 'রাই' বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। এদের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশী। তবে কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও দেখা যায়। হিন্দুধর্ম পালন করলেও এদের ধর্মের আচরণ বিধি ও প্রথা কিছুটা আলাদা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হিন্দু হলেও এরা শবদেহ দাহ না করে কবর দিয়ে থাকে এবং গো-মাংস ভক্ষণ করে। শূয়োর ও অন্যান্য পশুর মাংসও এদের কাছে অখাদ্য বা অস্পৃশ্য নয়।

এই কিরাতি বা কীচক জাতির অন্যতম শাখা হচ্ছে 'লিম্বু'। নেপাল, তিব্বত ও সিকিমের মধ্যবর্তী অরুণ নদীর পূর্বদিক পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে বলা হয় 'লিম্বুয়ানা', স্থানীয় ভাষায় বলে 'দুমরিচে'। লিম্বুরা এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী। লিম্বুরা নিজেদের 'সুব্বা' বলেও পরিচয় দিয়ে থাকে এবং পদবী হিসেবে অনেক সময় 'সুব্বা' লেখে। 'সুব্বা' শব্দের অর্থও প্রধান, যা গ্রামের মণ্ডল বা মুখ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হ'তো। কিন্তু গৌরবজনক হিসেবে সকলেই পরবর্তীকালে নিজেদের 'সুব্বা' বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। 'লিম্বু' শব্দের অর্থ ধনুর্বিদ্যা বিশারদ। এই নামকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে এরা প্রধানত শিকারী জাতি এবং ধনুক-বান ব্যবহার করায় পারদর্শী। তিব্বতীরা এদেরকে বলে 'চোঙ-পা'। এদের চেহারা ও শরীরের গঠনের মধ্যে টিবেটো-মোঙ্গলীয় রক্তের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে লিম্বুদের মধ্যে

দুটি গোষ্ঠী রয়েছে, একটি গোষ্ঠীকে বলা হয় 'কাশী গোত্র' বা 'নেপাল গোত্র'। অনুমান করা হয়, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের কাশী অঞ্চল থেকে নেপাল হয়ে এরা এই অঞ্চলে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল বলে আজও সেই ঐতিহ্যের সাক্ষ্য হিসেবে নিজেদের 'কাশী গোত্র' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের অপর গোষ্ঠীকে বলা হয় 'লাসা গোত্র'। এই অংশটি তিব্বতের সাং বা সিগাত্তি থেকে এসে এখানে মিলিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। সাধারণত 'কাশী গোত্র' বলে পরিচিত গোষ্ঠীর সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং লাসা গোত্র হিসেবে পরিচিতরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

গুরুং, মঙ্গার, থারু ইত্যাদি উপজাতিগুলি নেপালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এসে নেপালে বসবাস করতে শুরু করে বলে অনুমান করা হয়। জাতিতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, এই উপজাতিগুলির মধ্যে তিব্বতীয় যাযাবর জাতি এবং ভারতের দ্রাবিড় জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এজন্য এদের মুখাকৃতি, চোখ ও নাকের গঠনে ভারতের মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের চেহারার মিল দেখা যায়। এদের ভাষা মূলতঃ টিবেটো-বার্মান গোষ্ঠীর অন্তর্গত। অধিকাংশই হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও এদেরও ধর্মাকরণ পদ্ধতিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এদের সামান্য সংখ্যক বৌদ্ধধর্মও পালন করে।

তামাং (ধামাং) এবং শের-পা এই দুটি উপজাতিকে তিব্বতী জাতির শাখা বলে মনে করা হয়। এরা তিব্বত থেকে ক্রমশ সরে পূর্ব নেপালে বসতি শুরু করেছিল বলে ধারণা করা হয়। তামাংদের 'মুর্মী' বা 'লামা' বলেও অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে নেপালের অন্যান্য উপজাতিদের সংমিশ্রণ ঘটার ফলে এদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে মিশ্রিত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিব্বতী ভাষায় 'তা' শব্দেব অর্থ ঘোড়া এবং 'মাং' অর্থ সওয়ার, তাই অনুমান করা হয় যে তিব্বতী ঘোড় সওয়াররা কোন এককালে তিব্বত ছেড়ে চলে এসে নেপালের বাসিন্দা হয়ে ছিল। এদের চেহারায় মোঙ্গলীয় ছাপ রয়েছে ও ভাষাও তিব্বতী ভাষার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ! ধর্মও প্রধানতঃ বৌদ্ধ। শেরপাদেরও তিব্বতীদেরই অন্যতম শাখা বলা হয়। শেরপা শব্দের অর্থ পূর্বদেশের লোক। এরা পূর্ব তিব্বত থেকে নেপালে গিয়েছিল বলে মনে করা হয়। এদের দৈহিক গঠন, ভাষা ও আচার আচরণে তিব্বতী প্রভাব খুবই প্রকট, পোষাক পরিচ্ছদও তিব্বতী ধারার অন্তর্গত।

নেপালের বিভিন্ন উপজাতিগুলি বর্তমানে 'নেপালী' বা 'গোর্খালি' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীয় মধ্যভাগে পৃথ্বিনারায়ণ শাহ নামে এক বীর নেতা নেপাল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা উপ-

জাতিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে 'গোর্খা' নাম দিয়ে এক যোদ্ধদল গঠন করেন এবং ক্রমশ নেপালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা জয় করে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি নেপালের নেওয়ার রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে কাঠমাণ্ডুতে তার রাজধানী স্থাপন করেন। তার প্রভাবে নেপালের সমস্ত উপজাতিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের 'গোর্খালি' জাতি বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে 'গোর্খালি' ও 'নেপালী' শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। নেপালের বর্তমান রাজবংশ এই পৃথ্বি-নারায়ণ শাহর উত্তরপুরুষ। পৃথ্বিনারায়ণ শাহকেই নেপাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও জনক বলা হয়।

সিকিমের পশ্চিম সীমারেখা নেপালের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। নেপালে গোর্খা অভ্যুত্থানের পরে স্বাভাবিকভাবেই পৃথ্বিনারায়ণ শাহ'র সিকিমের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তার গোর্খা বাহিনী নিয়ে মাঝে মাঝেই তিনি সিকিমে অতর্কিতে হানা দিতে শুরু করেন। কিন্তু তিব্বতের হস্ত-ক্ষেপের ফলে সিকিমকে গ্রাস করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। পৃথ্বিনারায়ণ শাহ'র মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রতাপনারায়ণ শাহ নেপালের রাজা হন। তিনিও মাঝে মাঝেই সিকিমকে আক্রমণ করেন ও অরুণ নদী পর্যন্ত সিকিমের অংশ দখল করে নেন। 1791 খ্রীষ্টাব্দের চীন-নেপাল শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত গোর্খাদের আক্রমণে সিকিম প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তিব্বতের অভিভাবকত্বই সিকিমকে নেপালের আগ্রাসন থেকে বার বার রক্ষা করে। সিকিমের ভুটিয়া শাসকরাও নেপালের উপজাতিদের সিকিমে অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রতিরোধের সেই কঠিন বাধা অতিক্রম করে নেপালীদের পক্ষে সিকিমে অনুপ্রবেশ করা সম্ভব হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নেপালের বিভিন্ন উপজাতিরা ধীরে ধীরে সিকিমে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। পার্বত্য উপজাতিদের পক্ষে হাঁটা পথে দুর্গম পর্বতচূড়া অতিক্রম করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গতায়াত কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। নেপালীরাও যে এইভাবেই সিকিমে প্রবেশ করেছে সেটাই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হওয়া উচিত। কিন্তু সিকিমে নেপালীদের অনুপ্রবেশ ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পিছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ও স্বার্থচেতনা আরও বেশী সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

এই সময় সিকিমের কয়েকজন সামন্তপ্রভু বা 'কাজী' ব্যক্তিগত স্বার্থে কিছু কিছু নেপালী কৃষক এনে তরাই অঞ্চলের নীচু জমিতে চাষ আবাদের জন্য বসাতে শুরু

করে। এর কারণ, লেপচা ভুটিয়াদের চেয়ে নেপালীরা অনেক বেশী কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী জাতি। দ্বিতীয়তঃ, লেপচা-ভূটিয়ারা পাহাড়ের উচ্চাংশের ঠাণ্ডা আবহাওয়া ছেড়ে নিম্নাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়ায় বাস করতে অভ্যস্ত ছিল না। তৃতীয়তঃ, লেপচা ভুটিয়াদের তুলনায় নেপালীরা কৃষিকাজে অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিল। সুতরাং নিম্নাঞ্চলের তরাই ভূমিতে চাষের কাজে নেপালী কৃষকরা ছিল অত্যন্ত উপযোগী ও লাভদায়ক। সিকিমের তৎকালীন প্রধান লামারা ও প্রভাবশালী ভুটিয়া-লেপচা ব্যক্তিরা এভাবে নেপালী কৃষক বসানোর ব্যাপারটি কখনই সুনজরে দেখেননি তাই বাধা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তৎকালীন মহারাজাও যে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না তা নয়। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে নেপালী অনুবেশের দুর্বার স্রোত আর রোধ করা সম্ভব হয়নি। সিকিমে ব্রিটিশ আধিপত্য শুরু হওয়ার পর নেপালী অনুপ্রবেশ আরও বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার জন ক্লড হোয়াইট অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রাস্তা ও সেতু তৈরী, মাল পরিবহণ ইত্যাদি কাজের জন্য বিপুলাকারে নেপালী কুলি এনে তিনি সিকিমের নিম্নভূমি প্রায় পরিপূর্ণ করে তোলেন। এদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ধনী নেপালী এসে দরিদ্র ভুটিয়া-লেপচাদের কাছ থেকে জমি কিনে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া হোয়াইট বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভুটিয়া-লেপচা অধ্যুষিত সিকিমে হিন্দুধর্মাবলম্বী নেপালীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ব্রিটিশ দ্বিজাতি নীতির সূক্ষ্ম চালটি কার্যকরী করার বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

হোয়াইট-এর পরে চার্লস বেল সিকিমের নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে যোগ দেন 1908 সালে। নেপাল থেকে আগত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ যে ক্ষুদ্র সিকিম রাজ্যের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে চরম জটিলতার সৃষ্টি করছে তা কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই 1917 সালে তিনি লেপচা-ভুটিয়া অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার্থে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন যে, কোন অসিকিমী অথবা লেপচা-ভুটিয়া ব্যাতীত অন্য কোন ব্যাক্তির নিকট কোন লেপচা ও ভুটিয়া অধিবাসী তাদের জমি বিক্রী, বন্ধক বা দীর্ঘমেয়াদী ভাড়া (লীজ) দিতে পারবে না (*Revenue Order No. 1, 1917*)। এরপর 1956 সালে সিকিমের মহারাজা অপর এক আদেশে বিগত 20 বছরের মধ্যে লেপচা ও ভুটিয়া অধিবাসীগণ অ-লেপচা-ভুটিয়া ব্যক্তিদের কাছে যে সমস্ত জমি বিক্রয় করেছে বা বন্ধক বা দীর্ঘ

মেয়াদি ভাড়া দিয়েছে তা বাতিল বলে ঘোষণা করেন (*Proclamation of His Highness Sir Tashi Namgyal, 30th August, 1956*)।

কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও সিকিমে নেপালী অনুপ্রবেশের প্রবাহ রুদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। বরং গত শতাব্দী থেকে এই নেপালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন তা সিকিমের মোট জন সংখ্যার 75 শতাংশ হয়ে উঠেছে। নেপালী আগমনের গতি নিরীক্ষণ করে রিসলে সিকিম সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে বলা যায়—'The influx of these heriditary enemies of Tibet is our surest guarantee against a revival of Tibetan influence. Here also religion will play a leading part. In Sikhim, as in India, Hinduism will assuredly cast out Buddhism and the praying wheel of the Lama will give place to the Sacrificial implements of the Brahman. The land will follow the creed, the Tibetan proprietors will gradually be dispossessed and will betake themselves to the petty trade for which they have an undeniable aptitude.'

শুধু ধর্মের ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, নেপালীরাই সিকিমের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আর এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, সিকিমের বর্তমান রাজনৈতিক জীবনে নেপালীরাই হয়ে উঠেছে প্রকৃত চালক। নেপাল থেকে আগত জনস্রোত এখনও সমান ভাবেই অব্যাহত রয়েছে। আজকের সংখ্যালঘিষ্ঠ ভুটিয়া লেপচা ও অন্যান্য উপজাতিদের সিকিমে কতটা অধিকার ও অস্তিত্ব বজায় থাকবে তা ভবিষ্যতই জানে। □

ছয়

লামাতন্ত্র ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব

সিকিমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে বৈশিষ্টটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল, তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব। 1975 সালে ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্তির আগে পর্যন্ত এই তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম ছিল সিকিমের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। ফলে বর্তমানে যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালীরা অধিকাংশই হিন্দুধর্মাবলম্বী তবু সিকিমের আচার-আচরণে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, উৎসব-অনুষ্ঠানে সর্বত্রই এই বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। মহাযান বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত হলেও তিব্বতীয় এই বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বজ্রযান, কালচক্র যান ও হিন্দুতন্ত্রের সমন্বয়ে এক বিচিত্র ধর্ম রীতিতে পরিণত হয়েছে। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অবক্ষয়ী বৌদ্ধধর্ম যখন হিমালয়ের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে, তখন ভারতবর্ষেই সেই বৌদ্ধধর্ম নানা সংস্কারে, আচারে, অলৌকিক উপকথায়, আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের জটিলতায় হয়ে উঠেছিল ভারাক্রান্ত ও ক্রিয়া প্রধান। যে বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ছিলেন একান্তই নীরব এবং যিনি হিন্দু সংস্কারের বিরোধিতা করে এক নতুন ধর্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিলেন, সেই বুদ্ধ তখন ভারতীয় বৌদ্ধধর্মে অলৌকিক পুরুষ হিসেবে পূজিত হতে শুরু করেছেন এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণের মূর্তি পূজাই হয়ে উঠেছে এই ধর্মের মূল কেন্দ্র। এর সঙ্গে হিন্দু যোগ, শৈবতন্ত্র ও শাক্ততন্ত্রের 'শক্তি' আরাধনা প্রভৃতির গভীর সংমিশ্রনের ফলে বৌদ্ধধর্ম তার আসল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এক সংস্কারময় ধর্মাভ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, বৌদ্ধ লামাতন্ত্রের উদগাতা তিব্বতে কিন্তু সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ, যে দুর্লঙ্ঘ্য পার্বত্য বাধা তিব্বতকে প্রায় সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, সেইটিই এর অন্যতম কারণ। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতের রাজা 'স্রোং-চণ-গোম-পো'-এর সঙ্গে বিবাহ হয়

চীন ও নেপালের দুই রাজকুমারীর। উভয় পত্নীই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং এঁরাই রাজা স্রোং-চণ-গোম-পোকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন। তখন পর্যন্ত তিব্বতে কোন লিখিত ভাষা বা অক্ষরের প্রচলন শুরু হয় নি।

রাজা স্রোং-চণ-গোম-পো সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে তিব্বতী অক্ষর তৈরী করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার জন্য তাঁর মন্ত্রী 'সম-বো-তা'-কে কয়েকজন সঙ্গী সহ ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে পাঠান। এই প্রতিনিধি দলটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে তিব্বতী ভাষার এক লিখন বিধি তৈরী করা এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা। দুর্গম তুষার পথ পদযাত্রায় অতিক্রম করে মাত্র কয়েকজন প্রতিনিধি শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারা দীর্ঘকাল কাশীতে অবস্থান করে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন এবং তিব্বতে ফিরে গিয়ে এঁরাই প্রথম 'উ-চেন' ও 'উ-মেদ' এই দুই ধরণের লেখ্য ভাষার সৃষ্টি করেন। কিন্তু রাজা স্রোং-চণ-গোম-পো'র আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম তেমন বিস্তৃতি লাভ করতে পারে নি, কেবল তার পরিচয় ঘটেছিল মাত্র।

সেই সময় তিব্বতে যে প্রাকৃতিক ধর্ম অনুসৃত হতো তাকে বলা হয় 'বোন' (Bön) ধর্ম। এই বোনধর্মীরা কিছুটা ব্রাহ্মণ্য শৈবতন্ত্রের মত পরমেশ্বর ও শক্তির উপাসনায় বিশ্বাস করতো এবং অলৌকিক শক্তি অর্জন করার জন্য সাধনা ও ক্রিয়া করাকে বিশেষ প্রাধান্য দিত। তাদের মতে, জীবের প্রাণস্পন্দন হলো মহাশূন্যের খণ্ড প্রকাশ এবং 'বোনকায়' জীবের অন্তরেই বিরাজ করেন। কিন্তু জীবের চিত্ত জাগতিক সুখ সম্ভোগের কামনা-বাসনায় আসক্ত থাকায় অজ্ঞানতার মোহে সেই জ্যোর্তিময় মহাশূন্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। জীব যদি নিয়মিত বোনধর্মের নির্দেশিত পথে ধ্যান ও ক্রিয়া আচরণ করে তবেই সেই মহাশূন্যের স্বরূপের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। তিব্বতে এই 'বোন-পা' ধর্মের বিপুল প্রভাবের কাছে নতুন এই বৌদ্ধধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য ছিল না।

অষ্টম শতাব্দীতে রাজা স্রোং-চণ-গোম-পোর প্রপৌত্র রাজা 'থী-সোন-দে সান' পুনরায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসার করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর আমন্ত্রণে ভারতবর্ষের বৌদ্ধভিক্ষু শান্ত রক্ষিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের বাণী নিয়ে প্রথম তিব্বতে প্রবেশ করেন। কিন্তু স্থানীয় বোনধর্মী অধিবাসীদের মনে প্রভাব বিস্তার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই তাঁরই আহ্বানে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন বলে খ্যাত

গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বতে যান আনুমানিক 740 খ্রীষ্টাব্দে। গুরু পদ্মসম্ভব তন্ত্রাচারী বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর তান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে স্থানীয় মানুষদের চমৎকৃত করে তাদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন। বলা যায়, গুরু পদ্মসম্ভবই তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি তিব্বতের বিখ্যাত 'সা-মীয়ে' গোম্পা নির্মাণ করান এবং বহু তিব্বতীকে ভিক্ষুব্রত অবলম্বনের দীক্ষা দেন। আজও তাই গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বতীদের কাছে অবতার রূপে পূজিত। সুতারাং অষ্টম শতাব্দীতে যে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের সংগে তিব্বতীদের প্রথম পরিচয় হ'ল তা সর্বাস্তিবাদ এবং এবং তন্ত্রের সংমিশ্রিত স্বরূপ মাত্র। আরও বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম যখন তিব্বতে অনুপ্রবেশ করে তখন খুব স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয় সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির সঙ্গে কিছুটা আপোষ করতে হয়। এরফলে তিব্বতে তৎকালীন অনুসৃত 'বোন' ধর্মের কিছু কিছু আঙ্গিক ও ভৌতিক আচার অনুষ্ঠানও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্যতম অংশ হয়ে ওঠে। তাই সেই ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম নামে নবতর রূপে আত্মপ্রকাশ করল।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় অধ্যায়কে বলা যায় শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের যুগ। অতীশ দীপঙ্কর একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে যান এবং বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেখানে বৌদ্ধধর্ম যে জটিল আচার অনুষ্ঠানে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল তার সংস্কার সাধন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর আদর্শ সর্বজনস্বীকৃত না হওয়ার ফলে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মীদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, আদি 'ঞিঙ-মা পা' (*mnying-ma-pa*) গোষ্ঠী এবং সংস্কারবাদী 'কা-দম-পা' (*Bkah-gdams-pa*) গোষ্ঠী। তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই সময় থেকেই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর প্রচলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে তিব্বতে আরও বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম শাখা-প্রশাখা বহুল হয়ে ওঠে। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে লামা 'চোঙ-খা-পা'র নেতৃত্বে ঐ 'কা-দম-পা' সম্প্রদায়েরই নবসংস্করণ 'গে-লুগ-পা' (*Dge-lug-pa*) সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটে এবং তারা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষমতা যুগপৎ অধিকার করে নিয়ে 'লামাতন্ত্র' বা Grand Hierarchy-র সূচনা করে। 'দালাই লামা' হলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধান ধর্মগুরু। 'লামা' শব্দটি তিব্বতী 'ব্লামা' শব্দের উচ্চারিত রূপ, যার অর্থ হ'ল অদ্বিতীয় বা শ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ প্রধান লামা 'দালাই লামা' অনিবার্য ভাবেই হলেন অদ্বিতীয়, যার উপরে আর কোন শক্তির স্থান থাকতে পারে না। ধর্মীয় গুরু এক দিকে হলেন রাষ্ট্রশক্তির ধারক, গোম্পা বা মনাসটারী হ'ল রাজ দরবার. সন্ন্যাসীর

পতাকা হ'ল রাষ্ট্রের নিশান। বলা যায়, রাষ্ট্র ও নীতির এই প্রথম মিলন ঘটলো। ধর্ম হ'ল রাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি অসাধারণ উদাহরণ বলে উল্লেখ করা যায়। ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে ধর্ম এবং রাজতন্ত্র দুটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ধর্ম ও রাজশক্তির মধ্যে ক্ষমতা ও প্রাধান্যের বিরোধে ধর্মগুরু পোপকে পরাজিত হয়ে নির্বাসিত হতে হয়েছে ভ্যাটিকান নগরীতে। ধর্মের স্থান সেখানে রাজশক্তির উপরে নয়। ধর্ম ও রাজতন্ত্রের সমন্বয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা আদর্শ ভারতবর্ষেরও লক্ষ্য ছিল। স্বয়ং বুদ্ধও ধর্মকে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রধান নীতি হিসাবে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে একমাত্র 'প্রজাহিতৈষী ও প্রবুদ্ধ রাজাই' মানব সমাজের নৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে। বুদ্ধের সেই আদর্শ প্রথম বাস্তবায়িত হ'ল তিব্বতের সুউচ্চ তুষারাচ্ছাদিত শিলাভূমিতে।

ঐতিহাসিক তথ্যে জানা যায়, সিকিম ও ভুটান এই দুটি রাজ্যেরও স্থাপনা হয়েছিল মূলতঃ তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে। তিব্বতী লামাদের তত্ত্বাবধানে উভয় দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মকেন্দ্রিক রাজতন্ত্র। তিব্বতের মতে 'লামাতন্ত্র' না হলেও লামাদের অধীনস্ত রাজশক্তি এই দুই দেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে। উভয় দেশেই ধর্ম ও লামাদের স্থান ও প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও প্রধানত 'ঞিঙ-মা-পা সম্প্রদায়ভুক্ত তিব্বতী লামারা সিকিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে বার বার সিকিম রাজাদের তিব্বতের দালাই লামার সাহায্য এবং আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। শুধু ধর্মীয় ঐক্যই নয়, দালাই লামা তথা তিব্বত সরকার সিকিমের অভিভাবক রাষ্ট্র হিসেবে সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজ্যের জটিলতায় ও সঙ্কটে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ ছিল শিরোধার্য, তাঁর আশীর্বাদ ছিল পরম ভরসা। তিববতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম সিকিমেরও রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সিকিমের শাসন কর্তারা 'চো-গিয়াল' বা ধর্মরাজা নামে একাধারে রাজ্যরক্ষা ও ধর্মরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন।

তিব্বতের মত সিকিমের শাসনকার্যে লামারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও, শাসকগণের উপরে তাদের প্রভাব ও সক্রিয় ভূমিকা ছিল অপরিসীম। প্রত্যেক চো-গিয়ালের অভিষেক অনুষ্ঠিত হতো প্রধান লামাদের পরিচালনায় বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন অনুসারে। 'ত্রিরত্নে'র শরণ নিয়ে লামাদের হাত থেকেই তাঁরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করতেন এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে ও শাসনকার্যের প্রতি পদক্ষেপে

লামাদের গণনা, ভবিষ্যদ্বানী, উপদেশ ও আশীর্বাদের উপর নির্ভর করতেন পরম বিশ্বাসে। রাজ্যের নীতি নির্ধারণে ও সরকারী কাজকর্মে উচ্চ পর্যায়ের লামাদের মতামত ও পরামর্শের স্থান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি ইংরেজরা আসার পরে সিকিম যখন ব্রিটিশ সংরক্ষিত রাজ্য (Protectorate) হিসেবে পরিচালিত হয়েছে তখনও ব্রিটিশ সরকার সিকিমের এই 'Lhadi Medi' বা উচ্চ লামা সম্প্রদায়ের শক্তি ও প্রভাব অস্বীকার করতে পারে নি। এ বিষয়ে সিকিমের প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার জন ক্লড হোয়াইট লিখেছেন,—'The Monasteries and the Lamas were a great power in this land.' 1953 সালে যখন সাধারণ জনগণের আন্দোলনে ও চাপে সিকিমের মহারাজা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথম রাজ্য পরিষদ (State Council) গঠন করার কথা আইনত ঘোষণা করেন তাতেও দেখা যায় 'সঙ্ঘ' নামে লামাদের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। ভারত-ভুক্তির আগে পর্যন্ত প্রতি নির্বাচনেই এই 'সঙ্ঘ' আসনটিকে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং লামা সদস্য প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করেছে। আশ্চর্যের বিষয়, ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতির আদর্শে গঠিত ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে যখন সিকিমকে দ্বাবিংশতম রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল তখন কিন্তু সিকিমের এই 'সঙ্ঘ' আসনটি বিলোপ করা সম্ভব হয় নি, যদিও তা এক বিশেষ ধর্মের অন্তর্গত। তাই The Representation of Peoples Act 1951 সংশোধন করে সিকিমের বিধান সভায় এই 'সঙ্ঘ' আসনটি সংযোজন করা হয়। সিকিমের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ এই লামারা—যারা শিশুকাল হ'তে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গোম্পার বিচিত্র জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। তাদের সুবিধা অসুবিধা বা রাজনৈতিক দাবী-দাওয়াকে সাধারণ অন্য নাগরিকদের সঙ্গে সমান করে দেখা সত্যই সম্ভব নয়, হয়তো বা উচিতও নয়। তাই চার হাজারেরও বেশী লামার আবাসস্থান এই সিকিমের বিধানসভায় 'সঙ্ঘ' আসনটিকে অযৌক্তিক মনে হয় না। ঠিক একই কারণে, মন্ত্রী পরিষদেও একজন লামাকে স্থান দিতে হয়েছে! সিকিমের 137টি গোম্পা বা মনাসটারীর মধ্যে 52টি গোম্পা সরকার থেকে বাৎসরিক অনুদান পেয়ে থাকে। এই সমস্ত গোম্পা ও গোম্পা সংক্রান্ত বিষয়ে দেখাশোনার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সিকিম সরকারের Ecclesiastical Department বলে একটি বিশেষ বিভাগও রয়েছে। অবশ্য বর্তমান সিকিমে লামাদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত বিতর্কিত এই আসনটির বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মী নেপালী গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে শুরু হয়েছে।

সিকিমের সমাজ জীবনেও এই ধর্ম ও লামাদের স্থান এবং প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পরিবারগুলির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্মে, উৎসবে অনুষ্ঠানে, আপদে বিপদে লামারাই সর্বময় 'হোতা' এবং গোম্পা-গুলিই সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল। প্রত্যেক ভুটিয়া লেপচা পরিবার থেকে একজন পুত্রকে বাল্যকালেই লামাত্ব গ্রহণের জন্য গোম্পায় বা লামা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠাবার নিয়ম ছিল। সাধারণতঃ কোন পরিবারে দুইজন বা তিনজন পুত্র সন্তান থাকলে দ্বিতীয় পুত্রকে এই লামাত্ব গ্রহণের জন্য পাঠানো হতো। এখন অবশ্য এই নিয়ম তেমন আবশ্যিকভাবে পালন করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে লামারা কোন কোন বালকের মধ্যে অবতার বা বোধিসত্বের লক্ষণ দেখে তাকে তার পিতামাতার কাছ থেকে লামাত্ব গ্রহণের জন্য গোম্পায় নিয়ে যায়। এতে সেই বালকের পিতামাতা দুঃখিত না হয়ে বরং নিজেদের পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবান বলে মনে করে। এমন অনেক বালক বা কিশোর লামাকে গোম্পায় দেখা যায় যারা হয়তো বেশ কয়েক বছর কোন ইংরেজী স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেছিল। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হতে হয়, গোম্পার নিয়মবদ্ধ জীবনের মধ্যে বাস করা সত্বেও এই বালক লামাদের মুখে কিন্তু কোন বিষাদের চিহ্ন নেই।

সিকিমের সাধারণ মানুষের জীবনে এখনও এই লামারা 'ফিলসফার ও গাইডের' ভূমিকা নিয়ে থাকে। মরণাপন্ন রোগীকে হাসপাতালে দেওয়া হবে কিনা এ বিষয়েও তারা আগে লামাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়। আর শুধু সাধারণ মানুষই নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, উচ্চ শিক্ষিত ভুটিয়া লেপচা ও অন্যান্য বৌদ্ধধর্মী ব্যক্তিদের মনে এখনও লামাদের দৈবশক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রয়েছে। এমনকি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, ঘনিষ্ঠ সহবাসের ফলে এখানকার হিন্দু নেপালীদের জীবনেও তিব্বতী বৌদ্ধ সংস্কৃতি অলক্ষ্যে এক গাঢ় প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। তাই হিন্দুধর্মাচরণের সঙ্গে মিশে গেছে তিব্বতীয় বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান। লামাদের প্রতি তাদেরও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কম নয়। আপদে বিপদে তাদেরকেও একইভাবে লামাদের শরণ নিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই গভীর বিশ্বাস ও পরম ধর্মানুগত্যের উৎস কী ? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে বলা যায়, অন্ধ সংস্কার, অজ্ঞতা ও ধর্মভীতিই এই পরম বিশ্বাসের প্রধান কারণ। হিমালয়ের অত্যুচ্চ পর্বত শৃঙ্গ গভীর অরণ্য পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্গীয় বিভূতি প্রভৃতিতে এই অঞ্চলে যে এক অতিলৌকিক আবহাওয়া গড়ে উঠেছে, তাতে পার্বত্য এলাকার সরল হৃদয় সাধারণ

মানুষের মনে, ভৌতিক আত্মা, দানব, প্রেত, প্রভৃতির অস্তিত্বের এবং এক অতি প্রাকৃতিক জগতের অনুভূতি জন্মান খুবই স্বাভাবিক। সেই অনুভূতি প্রসূত অবতারবাদ ও বোধিসত্বগণের অস্তিত্ব ও জন্মান্তরে বিশ্বাসই তিব্বত তথা সিকিমের লামাতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি বলে অনেকে মনে করেন।

কিন্তু শুধুই কি অন্ধ সংস্কার, অজ্ঞতা ও ধর্মভীতি? সিকিমে 137টি বৌদ্ধ গোম্পা রয়েছে এবং সেখানে রয়েছে চার হাজারেরও বেশী লামা। এই গোম্পাগুলির আঁধারঘন অভ্যন্তরে চলেছে সেই আড়াই হাজার বছর আগের রহস্যকে জানার অন্বেষা—সেই অমৃতের সন্ধানে আজও শত শত লামা বা বৌদ্ধ ভিক্ষু পার্থিব জগতের সব কামনা বাসনা ত্যাগ করে নিরন্তর সাধনায় নিমগ্ন। এর সবটাই কি শুধু নিরর্থক অন্ধ সংস্কার? এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক সাধারণ মানুষের আপাত-উপলব্ধ জ্ঞানে দেওয়া সম্ভব নয়।

□

তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধরা প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—(ক) 'শ্বা-মার' অর্থাৎ লোহিত শিরাচ্ছাদনধারী (Red Hat Sect) এবং (খ) 'শ্বা-সের' বা পীত শিরাচ্ছাদনধারী (Yellow Hat Sect)।

(ক) লোহিত শিরাচ্ছাদনধারী সম্প্রদায়

ঞিঙ-মা-পা : অষ্টম শতাব্দীতে গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বতে প্রথম যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা সেই পথ অনুসরণ করেন এবং তাকেই গুরু রূপে স্বীকার করেন। এরাই তিব্বতের আদি বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলে গণ্য। সিকিমেও এই ঞিঙ-মা-পা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ লামারাই ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

কার-গিউক-পা : একাদশ শতাব্দীতে লামা মা-রো-পা এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। ইনি ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত নারো-পার শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর আদর্শেই এই সম্প্রদায় গঠন করেন। ইনি গুরু না-রো-পার নামেই স্ব-নাম মা-রো-পা গ্রহণ করেন বলে অনুমান করা হয়। তিব্বতের প্রখ্যাত কবি লামা মি-লা-রে-পা এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

সা-ক্য-পা : পশ্চিম তিব্বতের সা-ক্য গোম্পার অন্তর্গত লামারা সা-ক্য-পা সম্প্রদায় বলে পরিচিত। অনুমান করা হয়ে থাকে, সা-ক্য'র তৎকালীন শাসনকর্তা খো-খোঙ-চো-গ্যাল-পো এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। কিছুটা সংশোধিত ধর্মাচরণ পদ্ধতি অনুসরণ

করলেও সা-ক্য-পা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঞ্রিঙ-মা-পা সম্প্রদায়ের মতাদর্শের পার্থক্য খুবই সামান্য।

(খ) পীত শিরাচ্ছাদনধারী সম্প্রদায়

এই সম্প্রদায় গে-লুক-পা নামে পরিচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিব্বতের তৎকালীন অনুসৃত বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করে লামা-চোঙ-খা-পা এই নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে, দশম-একাদশ শতাব্দীতে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে সেখানকার জটিল সংমিশ্রিত বৌদ্ধধর্মকে সংশোধিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে স্থানীয় বৌদ্ধদের কাছে প্রবল বাধা পেতে হয়। এজন্য তিনি সংস্কারবাদী বৌদ্ধদের নিয়ে একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায় 'কা-দম-পা' নামে পরিচিত হয়। অতীশ দীপঙ্করের অবতার বলে লামা চোঙ-খা-পা মান্য হয়েছেন এবং তার প্রবর্তিত গে-লুক-পা সম্প্রদায়কেও কা-দম-পা সম্প্রদায়ের নব-সংস্করণ বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে গে-লুক-পা সম্প্রদায় তিব্বতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করে ধর্মরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। তিব্বতের শাসক লামা 'দালাই লামা' ও পান-চেন লামা এই গে-লুক-পা সম্প্রদায়ভুক্ত।

উপরোক্ত প্রধান সম্প্রদায়গুলির আবার বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায় বা উপশাখা রয়েছে। বিভিন্ন গুরু তথা নেতৃস্থানীয় লামাদের অনুসরণকারী শিষ্যদের নিয়ে উপ-সম্প্রদায়গুলি গড়ে উঠেছে। তবে এই উপ-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক মতভেদ অথবা ধর্মাচরণ পদ্ধতির পার্থক্য নিতান্তই নগন্য। □

সাত

উৎসব ও অনুষ্ঠান

সিকিমের সামাজিক ও লৌকিক জীবন প্রধানত ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে এসেছে। এখানকার উৎসব অনুষ্ঠানগুলিও তাই ধর্মকেন্দ্রিক এবং তিব্বতীয় প্রথা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভুটিয়া-লেপচা সমাজের উৎসবগুলি সাধারণত গোম্পাতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সেই অনুষ্ঠানের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে লামারা। নব্য সিকিমের জনসমাজে আজও সেই ধর্মীয় আনুগত্য ও ধর্মীয় প্রভাব সমভাবেই বর্তমান। এদের কয়েকটি প্রধান উৎসব হচ্ছে—লো-সুঙ, পাঙ-লাবসোল, বুম্-চু, ছাম, বুদ্ধজয়ন্তী বা সাগা-দাওয়া ইত্যাদি। হিন্দু নেপালীদের উৎসবগুলি অন্যান্য হিন্দু সমাজের মত হলেও এদের দঁশই বা বিজয়াদশমী এবং ভাইটিকা উৎসব খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উৎসবগুলি তিব্বতী পঞ্জিকা অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তিব্বতী পঞ্জিকা তিব্বতী সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিব্বতী পঞ্জিকায় চান্দ্র বৎসর বা চন্দ্রের পরিক্রমা অনুসারে কাল, ক্ষণ, দিন, মাস, বছর ইত্যাদি গণনা করা হয়। এরা পঞ্চভূত এবং দ্বাদশ জন্তুর নামানুসারে বছরগুলিকে চিহ্নিত করে। অগ্নি, জল, পৃথিবী, বণ ও লোহ—এই পাঁচটি উপাদান এবং বাঘ, ঘোড়া, বাঁদর, ভেড়া, কুকুর, শূয়োর, ষাঁড়, খরগোস, ইঁদুর, সাপ ও ড্রাগন—এই বারটি জন্তুর নাম নিয়ে একেকটি বছরের নামকরণ করা হয়, যেমন—লৌহ-বাঁদর, জল-বাঘ, অগ্নি-ঘোড়া ইত্যাদি। এইভাবে প্রতি ষাট বছর অন্তর এক চক্র আবর্তিত হয়। অর্থাৎ তিব্বতী পঞ্জিকা অনুসারে শত বছরে শতাব্দী হয় না, ষাট বছরের এই আবর্তনকে তিব্বতী ভাষায় বলা হয় 'রাব-জুঙ'। কোন কোন উপাদান ও কোন কোন জন্তুর মিলের উপরে বছরটির শুভাশুভ ফল নির্ভর করে বলে তাদের বিশ্বাস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লৌহ-

বাঁদর মিল হলে বছরটি তেমন শুভ হয় না এবং ভুটিয়া-লেপচারা সেই বছরে সাধারণত কোন শুভ কাজ, যেমন গৃহ-নির্মাণ, গৃহ-প্রবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিহার করে চলে।

লো-সুঙ

লো-সুঙ সিকিমের নববর্ষ উৎসব। এই উৎসবকে 'সোনাম-লো-সার'ও বলা হয়। লেপচা ভাষায় এই উৎসবকে 'লাম-বান' বলে। সিকিমী নববর্ষ তিব্বতী পঞ্জিকা অনুসারে এগার মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হয় (নভেম্বরের শেষ অথবা ডিসেম্বরের প্রথমে)। সাধারণত এই সময়ে ক্ষেত ফসলে ভরে ওঠে, নানাধরণের ফল, শাক-সব্জি উৎপন্ন হয়। তাই এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য প্রচুর খাদ্য সম্ভার অর্পণ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো। উৎসবের দিন পরিবারের সকলে খুব ভোরে ওঠে, হাত মুখ ধুয়ে সর্বপ্রথম তাদের গৃহদেবতার কাছে নানা উপাচারে পূজার্ঘ দান করে। এরপর তারা বাড়ীর আঙ্গিনায় বড় করে ধুনী জ্বেলে তাতে প্রচুর পরিমাণে ধূপ দিয়ে এমনভাবে ধুঁয়ো তৈরী করে যাতে আকাশে সূর্যের কিরণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। 'সুঙ' শব্দের অর্থই ধোঁয়া, এই প্রথাটির এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। শীতকালে তিব্বতে বরফে ঢাকা ভূমিতে প্রখর সূর্যের কিরণ এসে পড়লে তা অত্যন্ত অসহনীয় হয়ে ওঠে। এতে জমির ফসলও অনেক ক্ষেত্রে শুকিয়ে যায়। তাই ধোঁয়া তৈরী করে সূর্যের কিরণ থেকে কিছুটা আড়াল করার চেষ্টা করা হয়। মনে হয়, সেই প্রয়োজন থেকেই এই প্রথাটি প্রচলিত হয়েছে। সেই ধুনীর চারপাশে পরিবারের সকলে সমবেত হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'সুঙ-সেলো', অর্থাৎ আমাদের এই অর্ঘ গ্রহণ কর। এরপর তারা স্বর্গের দেবতা ও সর্প দেবতাদের আহ্বান জানায় নতুন বছরটি শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করার জন্য। উৎসবের প্রথম দিন তারা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের গৃহে যায় না এবং পরস্পর শুভ কামনা বিনিময় করে না। প্রথম দিনটি শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য নিবেদিত থাকে— সেদিন সকলে গোম্পাতে যায়, লামাদের উদ্দেশে চাল, অর্থ, ধূপ, খাদা ইত্যাদি অর্পণ করে। উৎসবের দ্বিতীয় দিন থেকে তারা পরস্পরকে গৃহে আমন্ত্রণ জানায় ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে। এইসময় পারিবারিক ছোট ছোট 'পিকনিকের' দলকে নানা স্থানে বসে আমোদ আহ্লাদ করতে দেখা যায়।

লো-সুঙ উৎসবের সমাপ্তি ঘটে 'গ্নেম-পা-গু-জম' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। উৎসবের নবম দিনে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। বলা হয় যে, এই দিনটিতে নয়টি অশুভ শক্তির সমাবেশ ঘটে। তাই এই দিনটিতে প্রত্যেকে অত্যন্ত সৎভাবে ও সাবধানে থাকার

চেষ্টা করে। এদের বিশ্বাস এই দিনটি বিচারের দিন, জাগতিক জীবনে যে যেমন কর্ম করে থাকে সেদিন পরলোকে তার বিচার হয়। বিচার করেন স্বর্গের রাজা 'শিঙ-ঝি-চো-গিয়াল'। এই বিষয়ে অনেক সময় লামারা নৃত্যনাট্যের আয়োজন করে। নানা রঙ-বেরঙের মুখোশ ও পোষাক পরে লামারা বিচিত্র অভিনয় প্রদর্শন করে। একজন সাজে শিঙ-ঝি-চো-গিয়াল, কয়েকজন সাজে পাপী এবং কয়েকজনকে পশু ও অপদেবতার মুখোশ পরিয়ে সাজান হয়। এই সমস্ত পশু ও অপদেবতাদের হাতে পাপীরা কিভাবে পরলোকে গিয়ে নানা অত্যাচার ও যন্ত্রণা ভোগ করে তার অভিনয় দেখান হয়। অন্যদিকে একজন পুণ্যাত্মা সাধুর আত্মাকে দোলায় বহণ করে 'খাম-দো-মা' বা দেবদূতগণ তাদের পরম গুরু 'চেন-রে-জি' বা অবলোকিতে-শ্বরের কাছে নিয়ে যায় ও সেই পুণ্যাত্মা মোক্ষলাভ করে। অভিনয়ের মাধ্যমে পাপ ও পুণ্যের এই পরিণতি দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ধর্মবোধ বিস্তার করাই এর উদ্দেশ্য।

পাঙ-লাব-সোল

সিকিমের অন্যতম প্রধান উৎসব হচ্ছে 'পাঙ-লাব-সোল' বা কাঞ্চনজঙ্ঘার পুজো। এখানকার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভূটিয়া লেপচা অধিবাসীদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে 'খাঙ-চে-জো-ঙ্গা' বা কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত-দেবতার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইনি সিকিমের অভিভাবক দেবতা রূপে আদৃত। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, এই দেবতা কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গে অবস্থান করেন, তাই সূর্যের প্রথম আলোক রশ্মি সর্বপ্রথম এসে স্পর্শ করে কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে। এই দেবতা অত্যন্ত শান্ত ও সুগুণ সম্পন্ন, ইনি ধর্মের প্রতিপালক ও শান্তি ও সমৃদ্ধিদায়ী। এই দেবতাকে ঐশ্বর্যের দেবতা বলেও মনে করা হয় এবং তাঁর আশীর্ব্বাদেই সিকিম প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়েছে বলে সকলের ধারণা। এদের আরও বিশ্বাস যে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতে অমূল্য ঐশ্বরিক সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে।

'খাঙ-চে-জো-ঙ্গা' (সংক্ষিপ্ত নাম 'জো-ঙ্গা') দেবতার কল্পিত মূর্তি রক্তবর্ণের, শ্বেত সিংহের উপর আরূঢ়, ডান হাতে ধৃত বিজয় দণ্ড, বাম হস্তে সম্পদের প্রতীক পশু নকুল। কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতমালার পাঁচটি শৃঙ্গকে দেবতার মুকুটের পাঁচটি চূড়া বলে কল্পনা করা হয় এবং বলা হয় ঐ পাঁচটি শৃঙ্গে পাঁচজন পশুকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, প্রথম বা সর্বোচ্চশৃঙ্গে রয়েছে ব্যাঘ্র, দ্বিতীয়টিতে সিংহ, তৃতীয়টিতে হস্তী, চতুর্থটিতে অশ্ব এবং পঞ্চম শৃঙ্গে রয়েছে বৈতনেয় বা গরুড় পক্ষী।

গল্প প্রচলিত রয়েছে যে অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বত যাত্রা কালে এই অজ্ঞাত পার্বত্য অঞ্চলেও ভ্রমণ করেন এবং বহু অমূল্য সম্পদ ও ঐশ্বর্য কাঞ্চনজঙ্ঘার গুহা কন্দরে গোপনে সংরক্ষিত করে যান। গুরু পদ্মসম্ভব নাকি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে নয়শ বছর পরে আবার তিনি এই অঞ্চলে আবির্ভূত হবেন এবং এই অজ্ঞাত স্থানের দ্বার ধর্মপরায়ণ মানুষদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন। এজন্য এরা লামা লাচেন-চেমবোকে গুরু পদ্মসম্ভবের অবতার বলে মনে করে। শোনা যায়, লামা লাচেন-চেমবো একদিন যখন 'ডুবডী' পর্বত চূড়ায় বসে ধ্যান করছিলেন তখন তাঁর সামনে দুজন বিশালাকৃতির দেবতা আবির্ভূত হয়ে তাঁকে সসম্মানে অভিবাদন করেন। এই দুই দেবতার একজন হচ্ছেন 'জো-ঙ্গা' বা কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং অপরজন তার প্রধান অধিনায়ক 'ইয়াব-দু'। লামা লাচেন-চেমবোও এই দুই দেবতাকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে পূজার্ঘ দান করেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরদান করতে চাইলে লাচেন-চেমবো এদের দুজনকে সিকিমের অভিভাবক দেবতা রূপে এই নবগঠিত রাজ্যের শান্তিরক্ষা ও ধর্ম প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা জানান। সেই থেকেই খাঙ-চে-জো-ঙ্গা সিকিমের অভিভাবক দেবতা হিসেবে পূজিত হয়ে আসছেন এবং এই পূজাকেই বলা হয় 'পাঙ-লাব-সোল'।

সিকিমের তৃতীয় চো-গিয়াল ছাগ-দর নামগিয়ালের আমল থেকে পাঙ-লাব-সোল প্রতি বছর উৎসব হিসেবে পালন করা শুরু হয়। সাধারণত বর্ষার শেষে শরতের শুরুতে, তিব্বতী পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তম মাসের পনের তারিখে বা পূর্ণিমাতে, এই উৎসব উদযাপিত হয়। এইদিন থেকেই সিকিমে শীতকালের সূচনা হয়। রাজ পরিবারের নিজস্ব গোম্পা 'তুঘ-লা-খাঙ'-এর উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে লামাদের নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সিকিমের অন্যতম প্রধান গোম্পা পেমা-ইয়াংসির লামারা প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেন। কারণ লাচেন-চেমবো পেমা-ইয়াংসি গোম্পাটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই পূজার সূচনা করেন। অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ আগে থেকে লামারা নানা পূজা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান করতে শুরু করেন 'তুঘ-লা-খাঙ' গোম্পাতে সমবেত হয়ে। উৎসবের আগে নিজেদের দেহ মন পবিত্র করা ও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেবতাকে জাগ্রত করাই এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য।

নির্দিষ্ট দিনে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও জনসাধারণের উপস্থিতিতে উৎসব শুরু হয়। লামারা বিচিত্র সাজ পোষাক ও মুখোশ পরে নৃত্য প্রদর্শন করে। একজন সাজেন 'জো-ঙ্গা' ও আরেকজন 'ইয়াব-দু'। জো-ঙ্গার মুখোশ লাল রঙের, মুখোশের উপরে

পাঁচটি নরকঙ্কালের মুণ্ড, গায়ে ব্রোকেডের উপরে কারুকার্য করা আলখাল্লা ধরণের পোষাক ও অলংকার। ইয়াব-দ্রুর মুখোশটিও প্রায় একই ধরণের তবে তার রঙ কালো। প্রথমে জো-ঙ্গা ও ইয়াব-দ্রু নৃত্য করতে করতে আসরে প্রবেশ করে। শিঙা, দামামা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নিনাদে আকাশ মুখর হয়ে ওঠে। এরপর তিব্বতের প্রাচীনকালের যোদ্ধবেশে সজ্জিত হয়ে কয়েকজন লামা যোদ্ধার নৃত্য করতে করতে প্রবেশ করে। তাদের হাতে থাকে ঢাল ও তরবারি—সুদক্ষ যোদ্ধার মতই তারা তরবারির খেলা দেখায়। অশুভ, অমঙ্গল, অকল্যাণ, অপদেবতাদের বিরুদ্ধে চলে কাল্পনিক যুদ্ধ। যুদ্ধের চরম নাটকীয় মুহূর্তে প্রবেশ করে দেবতা 'মহাকাল'। মহাকাল অসত্যের উপরে সত্যের বিজয় ঘোষণা করেন এবং জো-ঙ্গা ও ইয়াব-দ্রু'কে অভিনন্দন জানান। এই সময় তিনটি সুসজ্জিত ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে তিনজন সহিস আসরে প্রবেশ করে। জো-ঙ্গা, ইয়াব-দ্রু ও মহাকাল সেই ঘোড়ায় চড়ে প্রস্থান করে। পাঙ-লাব-সোল উৎসবের মধ্যে আমাদের শারদোৎসবের একটি সূক্ষ্ম মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় বলেই শুধু নয়, আমাদের মহিষাসুরমর্দিনী রূপকল্পের মধ্যেও তো এই অশুভের উপরে শুভর, অকল্যাণের উপরে কল্যাণের, অসত্যের উপরে সত্যের বিজয়ের সংকেত রূপায়িত হয়েছে। খাঙ-চে-জো-ঙ্গা দেবতার উৎসব পাঙ-লাব-সোল-এর মধ্যেও সেই আদর্শেরই প্রকাশ দেখা যায়।

গুড়া-ছাম

সিকিমের বৌদ্ধ সংস্কৃতির আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'ছাম' বা ধর্মীয় নৃত্যনাট্য। শুধুমাত্র ধর্মীয় নৃত্যনাট্য বললে 'ছাম'-এর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 'ছাম' একদিকে যেমন লামাদের আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান, তেমনি তা পূজারও অঙ্গ—বিশেষ বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান উদ্যাপন করা হয় এই 'ছাম' বা লামাদের নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে। ধর্মীয় ইতিহাস, ধর্মীয় কাহিনী বা ঘটনা, জাতক কাহিনী প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হয় এবং এরমধ্যে এক অতিন্দ্রিয় দার্শনিক তত্ব ও নৈসর্গিক ধর্মানুভূতি ব্যঞ্জনা পায়। ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা তাই এর প্রধান ভিত্তি। নাটকের কুশীলব এবং দর্শকমণ্ডলী উভয় ক্ষেত্রেই সেই আত্ম-নিবেদনের ভঙ্গি মূর্ত হয়ে ওঠে। এই নৃত্যনাট্যগুলি তাই গণ-উপাসনার তাৎপর্য বহন করে।

'ছাম'-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় আঙ্গিক হচ্ছে নৃত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী মুখোশ ও বিচিত্র সাজ পোষাক। এই মুখোশগুলি ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন ও

প্রতীকী রঙের দ্বারা বিশেষভাবে নির্মিত হয় এবং এক অপার্থিব অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হয় সেই বিশালাকৃতির মুখভঙ্গিমায়। এই সাজ পোষাক ও মুখোশগুলি প্রায় প্রত্যেক গোম্পার ভাণ্ডারেই সংগৃহীত থাকে এবং বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত প্রধান প্রধান গোম্পা সংলগ্ন মুক্তাঙ্গনে 'ছাম' বা নৃত্যনাট্যগুলি অভিনীত হয়। লামাদের প্রাণবন্ত, হর্ষোৎফুল্ল নৃত্যাভিনয়ও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। নৃত্যের দৃপ্ত ছন্দ, ও বলিষ্ঠ গতির মধ্যে লামাদের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত সেই কারণেই অনুষ্ঠানের অনেক আগে থেকেই লামারা নানা আচার নিয়ম পালনের মধ্যে ও পূজা ও প্রার্থনার দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করে, দেহ মন শুদ্ধ করে। নৃত্যাভিনয়ের সময় শিঙা, দামামা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অতিলৌকিক আবহ-সঙ্গীত রচনা করা হয়।

পাঙ-লাব-সোল বা কাঞ্চনজঙ্ঘার পূজা-উৎসবকেও 'ছাম' আখ্যা দেওয়া যায়। এছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ 'ছাম' উৎসব সিকিমে উদযাপিত হয়। এগুলির মধ্যে 'গুড়া-ছাম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবকে 'কালো-টুপি' নৃত্য বলেও অভিহিত করা হয়। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'গুড়া-ছাম' উৎসবের সূচনা।

অষ্টম-নবম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা ছিলেন 'লাঙ-দার-মো'। তিনি অত্যন্ত হিংস্র, কুটিল ও ধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে লাঙ-দার-মো তাঁর ধর্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নেন এবং তিব্বতে নবপ্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মকে নির্মূল করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে নির্মমভাবে হত্যা করেন, বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেন ও পবিত্র বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থগুলি পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন। তার রাজ্যে প্রজারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ফলে তিব্বতে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়।

এই সময়ে 'পাল-দোর্জে' নামে একজন লামা ধর্মরক্ষার্থে ও জনগণকে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে গোপনে লাঙ-দার-মোকে নিধন করতে মনস্থ করেন। একদিন এই লামা কালো বেশ ও কালো টুপি পরে, একজন নৃত্যশিল্পীর ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজসভায় উপস্থিত হন। পোষাকের ভেতরে লুকিয়ে রাখেন একজোড়া তীর ধনুক। এরপর লাঙ-দার-মোর সামনে নৃত্য প্রদর্শন করতে করতে হঠাৎ তীর ধনুক বের করে তাকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়েন। লাঙ-দার-মো বুকে

তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এইভাবে তিব্বতে সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটে ও ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অধর্মের উপরে ধর্মের বিজয়ের এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে স্মরণ করে সিকিমেও 'গুড়া-ছাম' উৎসব পালিত হয়। সিকিমের 'ইঞ্চে' গোম্পার প্রাঙ্গনে লামারা নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে এই উৎসব পালন করে ও জগতের সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ কামনা করে। তিব্বতী পঞ্জিকার একাদশ মাসের অষ্টাদশ বা উনবিংশতিতম দিনে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

কাজিয়াৎ

সিকিমে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লামা লাচেন-চেমবো সিকিমবাসীর উদ্দেশে আটটি উপদেশ বাণী দান করে যান। তিব্বতী ভাষায় 'কা' মানে বচন বা বাণী ও 'জে' মানে আট। এই অষ্টবানীকে তাই 'কাজিয়াৎ' বা অষ্টমার্গ বলা হয়। এই উপলক্ষ্যেও লামারা প্রতিবছর বিশেষ পূজানুষ্ঠান ও নৃত্যাভিনয় করে থাকে। তিব্বতী পঞ্জিকার দশম মাসের শেষ দুই দিন অর্থাৎ 'লো-সুঙ' উৎসবের দুদিন আগে এই কাজিয়াৎ নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে। যেহেতু লামা লাচেন-চেমবো ঞিঙ-মা-পা সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন তাই ঞিঙ-মা-পা সম্প্রদায়ের লামারা এই অনুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কাজিয়াৎ নৃত্য লামা লাচেন চেমবোর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হয়। নৃত্যের শেষে ময়দা, কাঠ ও কাগজ দিয়ে তৈরী অশুভ আত্মা ও অপদেবতাদের প্রতিমূর্তি আগুনে জ্বালান হয়। এর মাধ্যমে দেশের সমস্ত অশুভ ও অমঙ্গলকে ধ্বংস করে নতুন বছরের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

সিকিমে আরও কয়েকটি বিশেষ 'ছাম' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—পঞ্চম মাসের দশ তারিখে হয় 'সে-চু-ছাম' এবং শীতকালে অনুষ্ঠিত হয় 'গুথোর-ছাম'। এই অনুষ্ঠান দুটি সাধারণত রূমটেক গোম্পাতে আয়োজিত হয়। অনেকের মতে পাঙ-লাব-সোল ও কাজিয়াৎ এই দুইটিই সিকিমের নিজস্ব উৎসব। অন্যান্য উৎসবগুলি তিব্বতী ভুটিয়াদের সঙ্গে সিকিমে এসেছে এবং পরে সিকিমের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বুম-চু

সিকিমের প্রাচীন ও প্রখ্যাত গোম্পাগুলির অন্যতম 'তাসী-ডিং' পবিত্রতম গোম্পা

হিসেবে পরিচিত। পশ্চিম সিকিমে প্রায় 4500 হাজার ফুট উচ্চ একটি পর্বত চূড়ায় এই গোম্পাটি অবস্থিত। তাসী-ডিং গোম্পাতে প্রতিবছর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়, তিব্বতী ভাষায় তার নাম 'বুম-চু' (বুম=পাত্র, চু=জল)। তিব্বতী পঞ্জিকার দ্বিতীয় মাসের চতুর্থ দিনে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

সিকিমে ধর্মরাজ্য স্থাপনের অগ্রদূত যে তিনজন লামা তিব্বত থেকে সিকিমে এসেছিলেন, তাঁদের অন্যতম নাদাক-সেমপো এই তাসী-ডিং গোম্পাটি তৈরী করেন। ঐ গোম্পাতে দুটি জলপূর্ণ পাত্র রয়েছে। শোনা যায়, ঐ দুটি জলপূর্ণ পাত্রের উপরে লামা নাদাক-সেমপো একশ ত্রিশ কোটি বার মন্ত্র জপ করে তা পবিত্র বারিতে পরিণত করেন। সেই পবিত্র জলের পাত্র দুইটি আজও পরম যত্নে সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে গভীর রাত্রে এই পাত্রদুটির মুখ খুলে নির্দিষ্ট একটি ছোট পানপাত্র দিয়ে এই জল পরিমাপ করা হয় এবং আবার পাত্র দুটির মুখ সর্বসম্মুখে 'সীল' করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাত্রের মুখ বন্ধ করার আগে তিন পানপাত্র পবিত্র জল নিয়ে সাধারণ জলের সঙ্গে তা মিশিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং তিন পানপাত্র বেশী জল পাত্র দুটিতে ঢেলে দেওয়া হয়। জল পরিমাপের সময় পরিমানে যদি খুব বেশী তারতম্য ঘটে তবে তা দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক বলে এরা মনে করে। কিন্তু জলের পরিমান যদি সামান্য বেশী হয় তাহলে দেশের পক্ষে তা শুভ ও সমৃদ্ধিদায়ক বলে এদের বিশ্বাস। পাত্রদুটি খোলার আগে লামারা নানা ধরণের পূজা ও প্রার্থনা করে।

সিকিম ও ভুটানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পূণ্যার্থী এই বুম-চু অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে ও পবিত্র বারি পান করতে আসে। এই তাসী-ডিং গোম্পাতে পৌঁছুতে হলে এখনও প্রায় তিন হাজার ফুট পাহাড়ী চড়াই রাস্তা হেঁটে উঠতে হয়। কিন্তু পূণ্যার্থী মানুষের কাছে তা কষ্টকর বলে মনে হয় না।

সাগা-দাওয়া

'সাগা-দাওয়া' অনুষ্ঠানটিকে প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধজয়ন্তী বলা যায়। বুদ্ধের জন্ম, মৃত্যু ও বোধিলাভ ঘটেছিল একই তিথিতে, আমরা বৈশাখী পূর্ণিমার দিনটিকে সেই তিন পরমলগ্নের দিন হিসেবে পালন করে থাকি। কিন্তু তিব্বতী পঞ্জিকা অনুসারে মহাযান বৌদ্ধরা চতুর্থ মাসের পূর্ণিমাতে এই উৎসব উদযাপন করে। সাধারণত আমাদের জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাতে সাগা-দাওয়া উৎসব পালিত হয়।

উৎসবের দিন নারী-পুরুষ-বালক-বালিকা নির্বিশেষে সমস্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ

পরম উৎসাহে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি মাথায় নিয়ে এক বর্ণময় শোভাযাত্রা করে পথ-পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকেন প্রধান লামারা। ধর্মীয় পতাকা, ধর্মচক্র, থাঙ্কা বা ধর্মচিত্র ইত্যাদি বহন করে চলেন তাঁরা, কেউ কেউ তাঁদের বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাতে বাজাতে চলেন। এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করাকে সকলে অত্যন্ত পূণ্য বলে মনে করে। শোভাযাত্রার শেষে নির্ধারিত কোন স্থানে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। প্রধান লামারা বিপুল জনসমাবেশে বক্তৃতা দেন, বুদ্ধের বাণী পাঠ, ধর্মকথা আলোচনা করেন। সেদিন বিভিন্ন গোম্পাতে বিশেষ পূজা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

বুদ্ধের জীবনের বিশেষ বিশেষ কাহিনী অনুসারে তিব্বত তথা সিকিমের মহাযান বৌদ্ধরা আরও কয়েকটি উৎসব পালন করে। তিব্বতী পঞ্জিকার প্রথম মাসে পালিত হয় 'ছুন-ধুল-দাওয়া' উৎসব। এই দিনটিতে ভগবান বুদ্ধ অষ্ট সিদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁর অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেন বলে এদের বিশ্বাস। ষষ্ঠমাসে পালিত হয় 'ড্রুক-পা-সে-সী' উৎসব বুদ্ধের প্রথম ধর্মপোদেশ দানের দিনকে স্মরণ করে। এরপর নবম মাসে অনুষ্ঠিত হয় 'লা-বাফ্-থু-চেন' উৎসব। কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যে বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভের পর জাগতিক শরীরে স্বর্গলোকে গমন করেন এবং পরে তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করে আবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। শোনা যায়, মধ্য ভারতের গোরখপুরের কাছে 'সায়েৎ-মায়েৎ' নামক স্থানে তিনি স্বর্গলোক থেকে এসে নেমেছিলেন। এজন্য বুদ্ধগয়ার মত এই সায়েৎ-মায়েৎ-ও সমস্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে পরম তীর্থ রূপে স্বীকৃত। তিব্বত ও সিকিমের মহাযান বৌদ্ধরা এই দুইটি তীর্থ দর্শন করাকে পরম পূণ্য বলে মনে করে। ভগবান বুদ্ধের এই স্বর্গ থেকে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের তিথিতে উদযাপিত হয় 'লা-বাফ-থু-চেন' উৎসব।

দঁশই ও ভাইটিকা

সিকিমে হিন্দু নেপালীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিও সিকিমী সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাই হিন্দু নেপালীদের কিছু কিছু উৎসব অত্যন্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে এখানে অনুষ্ঠিত হয়। এদের প্রধান উৎসব 'দঁশই' ও 'ভাইটিকা'। বিজয়া দশমীর দিনকে এরা বলে দঁশই এবং এইদিন থেকেই তাদের উৎসব শুরু হয়। দঁশই-এর দিন সকালে উঠে স্নান করে তারা নতুন জামা কাপড় পরে এবং গৃহের গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিরা কনিষ্ঠদের কপালে চাল চন্দন হলুদ ইত্যাদি মাখিয়ে দেয়

এবং মঙ্গল কামনা করে আশীর্বাদ করেন। তারপর শুরু হয় তাদের 'ভাইলো' বা 'দেও সুরে' গান—পুরুষরা দল বেঁধে ঢোলক, বাঁশী ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে গান গায়, গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে এবং পরিবর্তে গৃহস্থের কাছ থেকে চাল, অর্থ ইত্যাদি দান গ্রহণ করে। গানের প্রতি ছত্রের শেষে তারা বলে 'দেও সুরে'—অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু দান কর। বিজয়া দশমীর দিন থেকে শুরু করে 'ভাইটিকা' বা ভাই ফোঁটার দিন পর্যন্ত চলে এই 'দেও সুরে' গান। লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন মেয়ে-বৌরা সুন্দরভাবে প্রসাধন ও সাজসজ্জা করে প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে 'মারুণী' নৃত্য করে এবং সকলের জন্য কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে। বস্তী বা গ্রামাঞ্চলের মানুষরা এই সময় গরু, বাছুর, কাক, কুকুর প্রভৃতির 'তিয়ার' বা পূজা করে। সব শেষে হয় 'ভাই তিয়ার' বা ভাইটিকা উৎসব। প্রত্যেক হিন্দু নেপালীর গৃহেই 'ভাইটিকা' উৎসব অত্যন্ত ধূমধামের সঙ্গে পালিত হয়। এই দিন বোনেরা ভাইদের কপালে চাল চন্দন ও হলুদের প্রলেপ মাখিয়ে 'টিকা' বা ফোঁটা দেয়, গলায় পরিয়ে দেয় 'সাঁই পত্রী' বা গাঁদা ফুলের মালা। সাধ্য অনুসারে পরস্পর পরস্পরকে জামা কাপড় ইত্যাদি উপহার দেয়। সেদিন প্রত্যেক গৃহেই নানারকম সুখাদ্য প্রস্তুত হয় এবং এই খাদ্য তালিকায় 'শ্যাল রোটি' নামে ময়দা ও ঘি দিয়ে তৈরী এক ধরণের খাদ্য অবশ্যই থাকা চাই। আমাদের পরমান্নের মতই এই 'শ্যাল রোটি' তাদের শুভ খাদ্য। এরপর 'দেও সুরে' গানের লব্ধ টাকা দিয়ে সকলে ভোজের আয়োজন করে, 'রক্সী' বা মদ খায়, আনন্দ করে। □

আট

দ্রষ্টব্য স্থান

সিকিমের ভৌগলিক অবস্থান রাজনৈতিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এখানে দেশ-বিদেশের পর্যটক অতিথিদের গতিবিধির উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এজন্য পূর্বে রোঙ্গ-লী এবং উত্তরে ফো-দং-এর পরে বিশেষ অনুমতি ছাড়া ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। দক্ষিণে নামচি ও নয়া বাজার এবং পশ্চিমে গেজিং ও তার আশেপাশের কিছু স্থান ভ্রমণের জন্য উন্মুক্ত। সেই কারণে রাজধানী গ্যাংটক শহরেই ভ্রমণ বিলাসীদের ভিড় বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু সিকিমের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে দেখার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা জানেন, গ্যাংটক শহর দেখে সিকিমের প্রকৃত স্বরূপের ধারণা করা যায় না, প্রকৃতি যে অফুরন্ত সৌন্দর্যের ডালি উজার করে সাজিয়েছেন এই স্নেহধন্যা সুন্দরী দেশটিকে তার আভাস মাত্র সেখানে পাওয়া যায়। উত্তর সিকিমের হিমরাজ্য ইয়ুম-থাঙ, লা-চেন ও লা-চুং উপত্যকা, জঙ্গু গ্রাম, পূর্বে তিব্বত সীমান্তের নাথু-লার কাছে প্রায় 14 হাজার ফুট উচ্চতায় ফুলের সমারোহে পরিবেষ্টিত স্বচ্ছ সুবিস্তৃত ছাঙ্গু লেক প্রভৃতি স্থানের সৌন্দর্য দেখলে মনে হয় যেন স্বর্গলোকের প্রতিচ্ছবি আঁকা রয়েছে। অনেকের মতে, যিনি বা যারা কাশ্মীরকে 'ভূ-স্বর্গ' আখ্যা দিয়েছিলেন তারা সিকিমের এই অঞ্চলের সৌন্দর্য দেখেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসব অঞ্চলে সাধারণভাবে ভ্রমণ করার কোন সুযোগ নেই। তাই ভ্রমণ বিলাসীদের গ্যাংটক শহর ও তার পারিপার্শ্বিক কিছু স্থান ও দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখে তৃপ্ত হয়ে ফিরে যেতে হয়।

গ্যাংটক শহরের দ্রষ্টব্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সিকিম ইনস্টিট্যুট অফ টিবেটোলজি এ্যাণ্ড আদার বুড্‌টিস্ট ষ্টাডিজ-এর কথা। সিকিমের প্রাক্তন মহারাজা স্যার তাসী নাম-গিয়ালের প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। 1958 সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করার

সময় বলেছিলেন,—'It is right that we should remember that message today, it is right that we should study it fully in all its implications, and that we should have scholars sitting here in this institute to do this work, and thus spread a greater understanding of that message.' সেই থেকে বৌদ্ধধর্ম ও তিব্বতী জ্ঞানচর্চ্চার এই প্রতিষ্ঠানটি আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে এবং দেশ বিদেশের বহু জ্ঞান পিপাসু মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণা-কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদন লাভ করেছে। এর সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস রয়েছে, সেখানে গবেষক ও ছাত্ররা সাময়িক আশ্রয় পেতে পারেন। এখানকার গ্রন্থাগারে প্রায় তিন হাজারেরও বেশী বৌদ্ধধর্ম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই-এর সংগ্রহ আছে। এখানে একটি সংগ্রহশালাও রয়েছে এবং সেখানে বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন মূর্তি, স্বর্ণজলে লেখা প্রাচীন প্রজ্ঞাপারমিতা, তালপাতায় লেখা প্রাচীন পুঁথি, ধর্মাচরণে ব্যবহৃত প্রাচীন বস্তু ও শিল্প নিদর্শন, চীন ও তিব্বতে সূক্ষ্ম সূচিশিল্পের দ্বারা নির্মিত বহুমূল্য 'থাঙ্কা' বা ধর্মীয় চিত্র প্রভৃতি দর্শকদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে।

'থাঙ্কা' এক ধরণের ধর্মীয় চিত্র। তিব্বতী বৌদ্ধ গুরুদের জীবনের কোন ঘটনা বা তাদের বিশেষ ভঙ্গির চিত্র নিয়ে এগুলি তৈরী হয়। কাপড়ের উপরে সূক্ষ্ম সূচিশিল্পের মাধ্যমে অথবা রঙের সাহায্যে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে এগুলি তৈরী করা হয়। চিত্রের ধারগুলি বহু মূল্যবান ব্রোকেডের কাপড় দিয়ে জোড়া থাকে। 'থাঙ্কা' বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন মূল্যের হয়। পেমা-ইয়াংসি গোম্পায় একটি বৃহদাকার 'থাঙ্কা' আছে, যেটি কোন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট বলে ধারণা হতে পারে। বৌদ্ধ ভুটিয়া-লেপচাদের কাছে এই থাঙ্কাগুলি অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু। চীন, তিব্বত, সিকিম, ভুটান ও নেপালের গোম্পায় ও বৌদ্ধদের বাড়ীতে গেলেই বিভিন্ন ধরণের 'থাঙ্কা' দেখতে পাওয়া যায়। সিকিমের টিবেটোলজির সংগ্রহশালায় বহু প্রাচীন ও বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান 'থাঙ্কা' সংগৃহীত রয়েছে।

টিবেটোলজির সন্নিকটেই রয়েছে সুবিশাল 'ছো-তেন' বা স্তুপ এবং এর সংলগ্ন গোম্পাতে গুরু পদ্মসম্ভব ও বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের পূর্ণাবয়ব বিরাট মূর্তিও সকলকে বিস্মিত করে। কিংবদন্তী আছে যে, এখানকার গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তিটি নাকি অতি ধীরে ক্রমশ উচ্চতর হচ্ছে, এজন্য মূর্তির মাথাটি গোম্পার ছাদ ভেদ করে বাইরে রয়েছে।

টিবোটোলজির অপর পাশে রয়েছে অর্কিড স্যাংচুয়ারী। ফুল বিলাসীদের কাছে

এর আকর্ষণ অপরিসীম। সরকারের বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে এখানে বিভিন্ন জাতের আর্কিডের চাষ করা হয় ও বিদেশে রপ্তানী হয়। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে প্রস্ফুটিত এই ফুলের বাগানটি সত্যই মনোরম হয়ে ওঠে।

সরকারী কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠানটিও পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। এখানে সিকিমের নিজস্ব রীতিতে তৈরী হয় বিভিন্ন মাপের কার্পেট, কম্বল, কারুকার্য মণ্ডিত কাঠের আসবাবপত্র, হাতে তৈরী কাগজ, সিকিমী পোষাক পরিচ্ছদ ও আরও নানা ধরণের সিকিমী শিল্প বস্তু। এই সমস্ত জিনিষের নক্সা ও রঙের ব্যবহারের মধ্যেও সিকিমের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

গ্যাংটক থেকে 23 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিখ্যাত 'রুমটেক' গোম্পা, 'কারগিউগ-পা' সম্প্রদায়ের অধীন ও তিব্বতী রীতিতে গঠিত। সম্প্রতি প্রয়াত ষোড়শ অবতার করমা-পা লামা এটি প্রতিষ্ঠা করেন। রুমটেক গোম্পাটি সিকিমের অন্যতম প্রধান 'লামাসারী' বা আবাসিক লামা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবেও খ্যাত। এখানে 'নালন্দা' নামে বৌদ্ধধর্মে উচ্চ জ্ঞান লাভের একটি পাঠকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। গ্যাংটকে আরও দুটি বড় গোম্পা রয়েছে,—'ইঞ্চে' ও 'তুঘলাখাঙ'। 'ইঞ্চে' গোম্পাটি প্রধানত ক্রিঙ-মা-পা সম্প্রদায়ের তিব্বতী খাম্পা লামাদের পরিচালনাধীনে। 'তুঘলাখাঙ' রাজপরিবারের নিজস্ব গোম্পা, এটি প্রাক্তন রাজবাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিত।

গ্যাংটক শহর ছাড়া দক্ষিণ ও পশ্চিম সিকিমে পর্যটকদের ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। দক্ষিণের জেলা সদর নামচি ছোট্ট এক পাহাড়ী শহর, কিন্তু তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। নামচি থেকে বাসে বা মোটরে তিনঘন্টার যাত্রায় পৌঁছান যায় পশ্চিম জেলা সদর গেজিং বা গ্যালসিং শহরে। গেজিং থেকে 5 কিলোমিটার দূরে পেমা-ইয়াংসি নামক স্থানে আছে সরকারী পরিচালনাধীন একটি টুরিষ্ট লজ। সেখানে আশ্রয় নিয়ে পশ্চিম সিকিমের বিভিন্ন জায়গা দেখার ব্যবস্থা করা যায়।

'পেমা-ইয়াংসি'—যার অর্থ 'ভূমা পদ্ম' নামটি যেমন মাধুর্যময়, জায়গাটির নৈসর্গিক সৌন্দর্যও ঠিক তেমনি ভূমার দ্যোতনা বিচ্ছুরণ করে। একেবারে নিবিড় নৈকট্যে যেন আলিঙ্গণ করে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। রাত্রি শেষে প্রথম উষার সোনার বিন্দুটিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার কপালে দেখে মনে হয় যেন কোন মহামিলনের সময় প্রেয়সীর এয়োতির চিহ্নটি অলক্ষ্যে লেগেছে তার মুখে। সে দৃশ্য সত্যই অবর্ণনীয়।

টুরিষ্ট লজের পাশেই রয়েছে সিকিমের অন্যতম প্রাচীন পেমা-ইয়াংসি গোম্পা। এটি লামা লাচেন-চেমবো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে শুধুমাত্র ক্রিঙ-মা-পা

সম্প্রদায়ের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লামারা অবস্থান করেন। সিকিমের সমাজ জীবনে এই গোম্পার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পেমা-ইয়াংসি থেকে দুঘন্টা মোটর পথে যেতে হয় 'ইয়ক-সাম'—এই ঐতিহাসিক স্থানে তিনজন লামার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ইয়ক-সামে সিকিমের প্রথম রাজা ফুন্তসো নাম-গিয়ালের অভিষেকের স্মারক হিসেবে রয়েছে প্রাচীন "ছো-তেন" এবং তার সামনের বাঁধানো চত্বরে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে লামা লাচেন-চেমবোর পদচিহ্ন। ইয়ক-সামে যাওয়ার পথে 'রাব-দেন-সে'-র কাছে দেখা যায় প্রথম রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে পরবর্তীকালে রাজধানী এই রাব-দেন-সে থেকে গ্যাংটকে স্থানান্তরিত করা হয়।

উৎসাহ থাকলে পেমা-ইয়াংসি থেকে পায়ে হেঁটে 'জোঙ্গরী' থেকেও ঘুরে আসা যায়। এর উচ্চতা প্রায় 13 হাজার ফুট। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও সূর্যোদয়ের দৃশ্য অপার্থিব আনন্দ দান করে।

পেমা-ইয়াংসি থেকে 33 কিমি দূরে প্রায় 8 হাজার ফুট উচ্চতায় রয়েছে একটি প্রাকৃতিক জলাশয়—'খেচিপেরী' লেক। সিকিমবাসীদের কাছে এই লেকটি অত্যন্ত পবিত্র তীর্থ হিসেবে পরিচিত। এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস, এই লেকটি দেবী তারা জে-সুন-দোলমার কোলে অবস্থিত। আশ্চর্যের বিষয়, লেকটি যদিও ঘন গাছ-গাছালিতে পরিবেষ্টিত কিন্তু এর স্ফটিক স্বচ্ছ জলে কখনও একটি পাতাও ভাসতে দেখা যায় না। একটি পাতা ঝরে পড়লেই কোথা থেকে উড়ে আসে বুনো হাঁসের দল, ঠোঁটে করে সেই পাতাটি তুলে পরিস্কার করে দেয়।

সিকিমের অত্যুচ্চ পাহাড়ের চূড়ায়, ঘন অন্ধ গভীর জঙ্গলে এমনই অনেক রহস্য, অনেক অলৌকিকত্ব ছড়িয়ে রয়েছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক সভ্য-জগতের অবিশ্বাস ও অনাস্থা আজও তাই সিকিমের মানুষের পরম বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত হানতে পারেনি। সিকিমের প্রাকৃতিক পরিবেশে, মানুষের সমাজ জীবনে আজও তাই অনুভব করা যায়, 'শান্তি সত্য শিব সত্য সত্য সেই চিরন্তন এক'-কে।

সিকিম ভ্রমণের শেষে দু দণ্ডের শান্তি ও স্নিগ্ধ হৃদয় নিয়ে ফিরে আসে ভ্রমণ বিলাসীরা। পিছনে ধ্যানগম্ভীর কাঞ্চনজঙ্ঘা পরম সত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাথর-কাটা পথ বাঁকে বাঁকে পাক খেয়ে নেমে আসতে থাকে সমতলের দিকে, আর সারা পথের পাশে পাশে নেচে নেচে ছুটে আসে চঞ্চলা তিস্তা অতিথিকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে জানাতে। তার কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে শোনা যায়, 'থুচে থুচে থুচে'—ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। □

নাম-গিয়াল রাজবংশের শেষতম
চো-গিয়াল পল-দেন-থন-ডুপ

নতুন সিকিমের স্রষ্টা কাজী লেন-ডুপ দোর্জে ও কাজিনী।
(লেখিকাকে প্রদত্ত ছবি)

লামা সম্প্রদায়

কার্পেট বুননরত লাচুং-পা

টুকরীতে শিশুসহ নেপালী মা

চমরী গাই বাহন সহ উত্তর সিকিমের লাচেন-পা

গাড় জঙ্গু এলাকার লেপচা মেয়ে

খামপা মহিলা

তিব্বতী মহিলা

সিকিমী মহিলা

সিকিম রিসার্চ ইনসটিটিউট অফ টিবেটোলজি

রুমটেক গোম্পা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিকিমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (1642—1975 খ্রীষ্টাব্দ)

প্রসঙ্গক্রমে সিকিমের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাই এর আগের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তবু ঘটনা পরম্পরা অনুসারে এর সুবিন্যস্ত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সিকিমের ইতিহাসকে প্রধান তিনটি যুগে ভাগ করা যায়—(ক) ধর্মকেন্দ্রিকতা ও তিব্বতী অভিভাবকত্বের যুগ, (খ) ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের যুগ, (গ) ভারতীয় তত্ত্বাবধান ও নবযুগের পটভূমিকা। সিকিমের তিনশত বছরের ইতিহাস অনেক ভাঙ্গাগড়া ও উত্থান পতনের বন্ধুর পথে অগ্রসর হয়ে 1975 সালে ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। তাই 1642 সাল থেকে 1975 সাল পর্যন্ত ঘটনাবলীকেই সিকিমের ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায়।

ধর্মকেন্দ্রিকতা ও তিব্বতী অভিভাবকত্বের যুগ

তিব্বতী ভাষায় তিব্বতের ইতিহাসকে বলা হয় 'চো-জুঙ' অর্থাৎ 'ধর্মেতিহাস' (চো=ধর্ম, জুঙ=ইতিহাস)। সেখানে ধর্ম ও রাজতন্ত্র আলাদা সত্তা নয়, পৃথক প্রতিষ্ঠানও নয়, বরং বলা যায়, ধর্মীয় রাষ্ট্রতন্ত্র। তিব্বতের ইতিহাসে তাই কোন রাজা বা সম্রাটের কীর্তি কাহিনী বিবৃত হয় নি, সে ইতিহাস শুধু ধর্মীয় রাষ্ট্রের ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অনন্য নজীর। সিকিমের ইতিহাসকে, বিশেষ করে প্রথম যুগের ইতিহাসকে, ধর্মেতিহাস আখ্যা না দিলেও ধর্মকেন্দ্রিক ইতিহাস বলাই সঙ্গত। 1642 সালে তিব্বতের বৌদ্ধ লামাদের ব্যবস্থাপনায় যে রাজ্যের জন্ম হয়েছিল তার প্রাণকেন্দ্রে ছিল তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্মের মন্ত্র,—ধর্মের প্রসার ও প্রচার ছিল তার মূল লক্ষ্য। সেদিনের 'দেনজং' তথা সিকিম ধর্মরাজ্যরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার জন্মলগ্নে শোনা যায়নি রণভেরীর হুঙ্কার, অস্ত্রের ঝনঝনানি, আহতদের আর্তনাদ। শত্রুর রক্তে পিচ্ছিল হয়নি তার পথ। স্থানীয় লেপচাদের পক্ষে তিব্বতীদের প্রতিরোধ

করার ক্ষমতা যদিও ছিল না, তবু কোন কোন স্থানে বিরোধ যে একেবারেই হয় নি তা নয়। কিন্তু সে বিরোধ অস্ত্র দিয়ে জয় করার প্রয়োজন হয় নি, ধর্মের শান্তিবাণীতে তা সহজেই বশীভূত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের আলিঙ্গনে পার্বত্য উপজাতিরা, যারা সহজাত ভাবেই নির্বিরোধী, অনায়াসেই ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে। পরবর্তীকালেও সেই লেপচা ও ভুটিয়া বা তিব্বতীদের ঐক্য ছিন্ন হয়নি।

প্রথম চো-গিয়াল ফুন্তসো নাম-গিয়ালের শাসনকাল

লামাদের হাত থেকে রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করার পরে সিকিমের প্রথম চো-গিয়াল বা ধর্মরাজা ফুন্তসো নাম-গিয়ালের প্রথম কর্তব্য ছিল তীব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্মকে এই নতুন রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। স্বাভাবিক ভাবেই তার সময়ে ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাজকেই অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই সময়ে লামা লাচেন-চেমবোর তত্ত্বাবধানে তৈরী করা হয় বিখ্যাত পেমা-ইয়াংসির গোম্পাটি এবং লামা নাদাক-সেমপোর সহায়তায় তৈরী হয় তাসী-ডিং গোম্পা। সিকিমের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জনসাধারণের কাছে আজও এই দুটি গোম্পা অত্যন্ত মহাত্মপূর্ণ তীর্থস্থান। পেমা-ইয়াংসি গোম্পাতে শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণীর তিব্বতী লামারাই অবস্থান করতে পারেন। সিকিমের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই গোম্পা ও এখানকার লামাদের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আজও প্রায় অব্যাহত রয়েছে।

ফুন্তসো নামগিয়াল খুবই বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র রাজ্যকে 12টি জোঙ্গ বা জেলায় ভাগ করে আঞ্চলিক শাসনের ভার একেক জন 'জোঙ্গপণ' বা জেলাশাসকের উপর অর্পণ করেন। এদের মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় প্রভাবশালী লেপচাকেও জোঙ্গপণ পদে নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া বারোজন বিশ্বস্ত তিব্বতীকে তিনি মন্ত্রী বা সভাসদ নিযুক্ত করেন। এই বারোজন মন্ত্রী একদিকে যেমন তাঁর রাজকার্যে পরামর্শ দিয়ে তাঁকে সহায়তা করতেন, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে চো গিয়ালপন্থী মনোভাব গড়ে তোলার ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কাজেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাই এই মন্ত্রী পরিষদে প্রথমে কোন লেপচাকে স্থান দেওয়া হয় নি। তবে তিনি ঘোষণা করেন যে ধর্মপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতা অনুসারে যে কোন ব্যক্তিকে উচ্চতম পদে নিয়োগ করা হবে। এজন্য তিনি কয়েকটি উচ্চ রাজপদের সৃষ্টি করেন, যেমন—'চাঙ-জোৎ' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী, ''দো-নীয়ার' বা দেওয়ান, 'থুঙ-ইক' বা সচিব, 'দিঙ-পণ' বা সেনাধক্ষ্য ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এই সমস্ত উচ্চপদে লেপচাদেরকেও নিযুক্ত করা

হয়েছে। লেপচাদের আস্থা অর্জন করার জন্য ফুন্তসো নাম-গিয়াল একজন লেপচা মহিলাকে বিবাহ করেন। এই সময়ে রাজস্ব আদায়ের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম গড়ে ওঠে নি। জমি বণ্টনেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রচুর অবাধ খালি জমি থাকায় কৃষকরা ও পশু পালকরা প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যেত এবং ইচ্ছেমত জমি নিয়ে চাষ করতো। তাই উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ মাখন, মাংস ইত্যাদি ভোগ্য দ্রব্য রাজস্ব হিসেবে গৃহীত হতো। কিন্তু সেই রাজস্বেরও কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না—গ্রামবাসীরা তাদের সুবিধেমত এগুলি রাজাকে উপহার দিত।

ফুন্তসো নাম-গিয়ালের অভিষেকের পরেই তিব্বতের পঞ্চম দালাইলামা তাকে এই নতুন রাজ্যের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন এবং পারস্পরিক মৈত্রী ও বন্ধুত্ব রক্ষা করে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। সেই থেকে তিব্বত সিকিমের অভিভাবক রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা লাভ করে এসেছে। সিকিমের আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার জটিলতায়, অথবা বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে তিব্বত সর্বদাই অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে সর্বতোভাবে সিকিমকে সাহায্য করেছে।

সিকিমের রাজা বা চো-গিয়ালদের অনেকেই লেপচা, লিম্বু ও ভুটানের মহিলাদের বিবাহ করলেও 'গ্যাল-মো' বা প্রধানা মহিষী আসতেন তিব্বতের অভিজাত বংশ থেকে। তিব্বতের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসাও ছিল অবারিত। তিব্বত থেকে আসতো লবণ, পশম, রেশমের কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র, চা ইত্যাদি এবং সিকিম থেকে যেত চাল ও অন্যান্য শস্য, কাঠ, টিন প্রভৃতি। ব্যবসায়ের লেনদেনের মধ্যে শুকনো মাংস, ইয়াকের দুধের তৈরী 'ছুরপি' নামে এক ধরণের শক্ত মিষ্টি, কার্পেট ও বাঁশের তৈরী জিনিষপত্রও অন্তর্গত ছিল। তিব্বতী ভাষাই সিকিমের সরকারী ভাষা হিসেবে গৃহীত হয় এবং তিব্বতের সামাজিক প্রথা, উৎসব, অনুষ্ঠান সিকিমেরও উৎসব হিসেবে পালিত হতে শুরু হয়। তিব্বতী মহাযান বৌদ্ধধর্ম সিকিমের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে পরিগণিত হয়। তাই অনিবার্যভাবেই বলা যায়, সিকিম তিব্বতেরই প্রতিভূরাজ্য হিসেবে ভূমিষ্ঠ হয়ে তিব্বতেরই অভিভাবকত্বের আশ্রয়ে লালিত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় চো-গিয়াল তেন-সুঙ : স্থিতিশীল শাসন প্রবর্তন

ফুন্তসো নাম-গিয়ালের মৃত্যুর পর তার একমাত্র পুত্র তেন-সুঙ নাম-গিয়াল 1670 সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিমধ্যে 1654 সালে লামা লাচেন-চেমবোরও দেহান্ত ঘটে এবং পেমা-ইয়াংসি গোম্পার প্রধান লামা হিসেবে তিব্বত থেকে লামা

জিগমে গ্যাৎসো যোগদান করেন। পেমা-ইয়াংসি গোম্পার লামাদের নেতৃত্বে তেন-সুঙের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে সেই প্রথাই প্রত্যেক চো-গিয়ালের অভিষেকের সময় পালিত হতে থাকে। পেমা-ইয়াংসি গোম্পার লামাদের হাত থেকেই প্রত্যেক চো-গিয়াল রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

তেন-সুঙ শাসনকর্তা হিসেবে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি মন্ত্রীদের সংখ্যা বারো থেকে কমিয়ে আটজন করেন এবং কয়েকজন লেপচাকে মন্ত্রী পরিষদে গ্রহণ করেন। এই সমস্ত মন্ত্রী ও জেলা শাসকরাই পরবর্তীকালে 'কাজী' নামে অভিহিত হতে থাকে এবং বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। যদিও তেন-সুঙের আমলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে সিকিম আক্রমণের কোন সম্ভাব্য কারণ দেখা দেয় নি, তবু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি একটি রক্ষী বাহিনী গঠন করেন। এই রক্ষী বাহিনীতে একান্ত ভাবে ভুটিয়া-লেপচা ব্যক্তিদেরই শুধু নিযুক্ত করা হতো।

ধর্মপ্রচার ও তার প্রসারের কাজেও তেন-সুঙ নাম-গিয়াল যথপোযুক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে লামা জিগমে-গ্যাৎসোর তত্ত্বাবধানে সাঙ্গা-চো-লিং নামে বিখ্যাত গোম্পাটি নির্মিত হয়। এখানে লেপচা, লিম্বু ও অন্যান্য ভুটিয়াদের জন্য লামাত্ব গ্রহণ, লামা প্রশিক্ষণ ও পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ পেমা-ইয়াংসি ও তাসী-ডিং গোম্পায় একমাত্র উচ্চশ্রেণীর তিব্বতী লামাদেরই বসবাস করার অধিকার ছিল। লেপচা, লিম্বু বা অন্যান্য ভুটিয়ারা লামাত্ব গ্রহণ করলেও সেখানে তাদের স্থান ছিল না। সাঙ্গ-চো-লিং গোম্পার কৌলিণ্যও এজন্য কিছুটা কম—যদিও আকার, আকৃতি ও স্থাপত্য শিল্পে তা খুবই চিত্তাকর্ষক।

রাজ্য পরিচালনার বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিলেও ব্যক্তিগত জীবনে তেন-সুঙ ছিলেন কিছুটা শিথিল ও অসংযমী। তিনি তিনজন মহিলাকে বিবাহ করেন—এদের একজন ছিলেন তিব্বতের অভিজাত বংশের কন্যা, অপর একজন ছিলেন লিম্বু ও একজন ভুটানের মহিলা। লিম্বু স্ত্রী ছিলেন ইয়-ইয়-হাঙ নামে লিম্বুয়ানার প্রধানের কন্যা। বিবাহের সময় তিনি সাতজন লিম্বু সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সাতজন লিম্বু মহিলার সঙ্গে সিকিমের তৎকালীন সাতজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির বিবাহ হয়। এইভাবে তিব্বতী রক্তের সঙ্গে ক্রমশ লেপচা ও লিম্বু রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে শুরু করে এবং এই মিশ্রিত তিব্বতী বা ভুটিয়ারাই বর্তমানে 'সিকিম ভুটিয়া' হিসেবে পরিচিত।

তিন পত্নী থাকা সত্ত্বেও তেন-সুঙ তার একজন লেপচা মন্ত্রীর সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি

আকৃষ্ট হন ও গোপনে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করেন। তাসা-আফং নামে এই লেপচা মন্ত্রী থেকং-টেক'র বংশধর বলে পরিচিত ছিলেন। নিজের স্বার্থেই তাসা-আফং চো-গিয়ালের সঙ্গে তার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেন নি। কিছুকাল পরে সেই মহিলার একটি পুত্র সন্তান হয়। অনেকেই সন্দেহ করেন যে তেন-সুঙের ঔরসেই ঐ পুত্রের জন্ম। অত্যন্ত সুদর্শন সেই পুত্রের নাম রাখা হয় ইয়ুক-থিং-আরূপ এবং রাজ পরিবারের অভিজাত পরিবেশে রেখেই তাকে অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে সমানভাবে মানুষ করা হয়। পরে সিকিমের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়ে ইয়ুক-থিং-আরূপ বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চাগ-দর নাম-গিয়াল ঃ গৃহ বিবাদের শুরু

তেন-সুঙ নাম-গিয়ালের মৃত্যু হয় 1699 খ্রীষ্টাব্দে। প্রথা অনুসারে তার তিব্বতী স্ত্রীর পুত্র চাগ-দর নাম-গিয়ালকে মাত্র 14 বছর বয়সে চো-গিয়াল পদে অভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিকিমের এতদিনের শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় পরিবেশে ওঠে রাজনৈতিক সংঘাতের ঝড়। তেন-সুঙের ভুটানী স্ত্রীর কন্যা পেদি-ওয়াং-মো তার বৈমাত্রেয় ভাই চাগ-দরকে সিংহাসন চ্যুত করে নিজে সিকিমের শাসনভার গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেন। এ বিষয়ে কয়েকজন মন্ত্রীও তার সহায়ক হয়ে ওঠে। তাই পেদি-ওয়াং-মো তার ভুটানী মায়ের সাহায্যে ভুটানের দেবরাজা দেব-নাকু-জিন্দারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ভুটানের দেবরাজাও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করলেন না। তিনি অবিলম্বে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে রাব-দেন-সে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলেন (1700 খ্রীঃ)। সিকিমে তখন যে রক্ষী বাহিনী ছিল তাদের পক্ষে এই আক্রমণের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে রাজার কয়েকজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কয়েকজন উচ্চ লামা তরুণ রাজার প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে গোপনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে, নেপাল হয়ে তারা লাসায় পৌঁছে দালাই লামার আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। তিব্বতে তখন ষষ্ঠ দালাই লামার শাসন কাল। তিনি সাদরে এই আশ্রয়প্রার্থী রাজাকে গ্রহণ করলেন। রাজা চাগ-দরকে নিয়ে পলায়ণপর দলটি যখন তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন রাব-দেন-সে রাজপ্রাসাদ রক্ষার ভার দেওয়া হয় ইয়ুক-থিং-আরূপের উপর। ইয়ুক-থিং-আরূপ তখন রাজপ্রাসাদের কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজপ্রাসাদ রক্ষা করার জন্য তিনি আপ্রাণ শক্তিতে লড়াই করেন। কিন্তু ভুটানের দেবরাজার সুপরিচালিত

সৈন্য বাহিনীকে বাধা দেবার শক্তি তার ছিল না। রাব-দেন-সে রাজপ্রাসাদ ভুটানের দখলে আসে এবং ইয়ুক-থিং-আরূপকে বন্দী করে ভুটানে পাঠানো হয়। দীর্ঘ আট বছর (1700—1708) সিকিম ছিল ভুটানের অধিকৃত। দেবরাজার সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী সমস্ত সিকিম কবলিত করে নেয়। তবে সিকিমের পক্ষে সাময়িক এই পরাজয় লাভজনকই হয়েছিল। ভুটান সরকার রাব-দেন-সে প্রাসাদ সংস্কার করে নতুন ভাবে সেটি নির্মাণ করায়। এ ছাড়া সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি দুর্গ ও রাস্তা তৈরী করায়। সিকিমের অর্থনৈতিক অবস্থাও এ সময়ে যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল।

এই দীর্ঘ আট বছর অনভিজ্ঞ তরুণ চাগ-দর নাম-গিয়ালও দালাই লামার সস্নেহ আশ্রয়ে থেকে নিজেকে শাসনকর্তার পদের সুযোগ্য অধিকারী হিসেবে গঠন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। বিনয়ী ও বুদ্ধিমান চাগ-দর দালাই লামার এত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন যে দালাই লামা তাকে তিব্বতের কয়েকটি তালুক দান করেন। সেই ভূসম্পত্তি সিকিমের পরবর্তী রাজারাও বহুকাল ভোগ করেন। তিব্বতে থাকার সময়েই চাগ-দর সেখানকার এক অভিজাত পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। এরপর দালাই লামার তথা তিব্বত সরকারের মধ্যস্থতায় ভুটানের দেবরাজা সিকিম থেকে তার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। দালাই লামা দেবরাজাকে ব্যক্তিগত এক পত্রে লিখেছিলেন যে, একই ধর্মের অন্তর্গত এই তিব্বত, ভুটান ও সিকিম পিতা, মাতা ও সন্তানের মত একই পরিবারের সদস্যস্বরূপ। সুতরাং এই তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও মৈত্রী বাঞ্ছনীয়। তিব্বত সরকারের সহায়তায় চাগ-দর নামগিয়াল সিকিমে ফিরে এসে শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এই আট বছরে পূর্ব সিকিমের কোন কোন অঞ্চলে ভুটানের অধিবাসীরা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। ভুটানী ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে সে অঞ্চলগুলি আর মুক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় তা চিরতরে সিকিমের অধিকার থেকে চলে যায়। বর্তমান কালিম্পং এবং তার আশেপাশের কিছু জায়গা এইভাবে ভুটানের অন্তর্গত হয়ে যায়। চাগ-দর নাম-গিয়াল শান্তিরক্ষার জন্য এ নিয়ে ভুটানের সঙ্গে কোন বিরোধে যেতে চান নি।

চাগ-দর নাম-গিয়াল তাঁর সুদক্ষ শাসনে সিকিমের হৃতগৌরব ফিরিয়ে এনে শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর আমলে সিকিমের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তবে রাজ্যশাসনের চেয়ে লামাদের মত

আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করা তাঁর কাম্য ছিল অনেক বেশী। তাই ধর্মপ্রসারের কাজে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। তিনিই প্রথম সিকিমে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান গণউৎসব হিসেবে উদ্‌যাপন করার প্রথা প্রচলন করেন। তাঁর সময় থেকেই সিকিমের অন্যতম প্রধান উৎসব 'পাঙ-লাব-সোল' অর্থাৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেবতার পূজার প্রথা প্রতিবছর পালিত হওয়া শুরু হয়। ধর্মশিক্ষা প্রসারের জন্যও চাগ-দর বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নেন। প্রত্যেক বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী পরিবার থেকে অন্তত একজন পুত্র সন্তানকে লামাত্ব গ্রহণ করার জন্য গোম্পায় পাঠানোর প্রথা তিনি প্রায় অলিখিত আইন হিসেবে প্রযোজ্য করেছিলেন। আবশ্যিকভাবে না হলেও, আজও সিকিমের ভুটিয়া-লেপচা বৌদ্ধ পরিবারগুলি সে প্রথা পালন করে। চাগ-দরের বিশেষ আমন্ত্রণে জিগমে-পাও নামে তিব্বতের একজন অবতার লামা ধর্মশিক্ষা প্রসারের সহায়তার দায়িত্ব নিয়ে সিকিমে আসেন। লামা জিগমে-পাও সিকিমের লামা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-গুলির নিয়ম শৃঙ্খলার উন্নতি করতে এবং ধর্মশিক্ষার মান উন্নততর করতে সাহায্য করেন। লেপচা অধিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ব্যপক প্রচার করার উদ্দেশ্যে চাগ-দর নাম-গিয়াল লেপচা ভাষা সংস্কার করে তিব্বতী ভাষার অনুকরণে লেপচা লিপি তৈরী করেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ ও ধর্মানুশাসন লেপচা ভাষায় অনুবাদ করেন।

কিন্তু চাগ-দর নাম-গিয়ালের দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। তাঁর বৈমাত্রেয় বোন পেডি-ওয়াং-মো আবার তাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তবে এবার তাঁর সমর্থকের সংখ্যা বেশী ছিল না। বিশেষত পেডি-ওয়াং-মোর মধ্যে নাদাক-রিন-চেন নামে একজন লামাকে বিবাহ করায় অনেকেরই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবার ভুটান রাজার কাছ থেকেও কোন সাহায্যের আশা ছিল না। এজন্য পেডি-ওয়াং-মো সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেই ভয়ঙ্কর সুযোগ এসে গেল। 1716 সাল—সিকিমে প্রত্যাবর্তনের পর চাগ-দরের শাসনের মাত্র আট বছর পূর্ণ হল। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেকেই উপদেশ দিতে লাগলেন যে কিছুদিন বিশ্রাম এবং উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করলে তাঁর শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। এজন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও লামারা পরামর্শ করে রাজাকে পূর্ব সিকিমের রালং নামক স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণের তীরে নিয়ে যান। কিন্তু এই সময় রাজাকে যে তিব্বতী চিকিৎসক দেখাশোনা করছিল, পেডি-ওয়াং-মো তাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে এবং অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে রাজাকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেন। ঐ চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করার অজুহাতে চাগ-দরের কণ্ঠ নালীর একটি শিরা কেটে

দেয়। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে শেষে হতভাগ্য চাগ-দর নাম-গিয়াল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিন্তু এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হতে সময় লাগেনি। বিক্ষুব্ধ মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীরা পেডি-ওয়াং-মোকে শাস্তি দিতে মনস্থ করে। পেডি-ওয়াং-মো তখন নামচির কাছে অবস্থান করছিলেন। এক গভীর রাত্রে কিছু লোক তার ঘরে ঢুকে গলায় সিল্কের 'খাদা' জড়িয়ে তাকে হত্যা করে। সেই চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড হয়। সিকিমের রাজনীতিতে এরপর কিছুদিনের জন্য শান্তি ফিরে আসে।

চতুর্থ চো-গিয়াল গিউর-মেদ ঃ নতুন সমস্যার উদ্ভব

1717 সালে চাগ-দরের দশ বছরের পুত্র গিউর-মেদকে চো-গিয়াল বলে ঘোষণা করা হয়। লামা জিগমে-পাও তখন পেমা-ইয়াংসি গোম্পার প্রধান, তিনিই বালক রাজার প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। গিউর-মেদ বাল্যকাল থেকেই কিছুটা খামখেয়ালি ছিলেন, যদিও তার বিচার-বুদ্ধিতে তেমন কোন অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় পাওয়া যায় নি। লামা জিগমে-পাও ভেবেছিলেন, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ও বিবাহের পরে গিউর-মেদ'র এই চারিত্রিক ত্রুটি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নি। সিকিমের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে আবার এক নতুন নাটকের সূচনা হয়।

1718 সাল থেকে মোঙ্গলরা বার বার তিব্বত আক্রমণ করে বৌদ্ধ গোম্পাগুলি ধ্বংস করতে শুরু করে। সেই সময় ঞিঙ-মা-পা সম্প্রদায়ভুক্ত তিব্বতের মিণ্ডো-লিং গোম্পার মঠাধক্ষ্য সপরিবারে পালিয়ে এসে সিকিম সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই মঠাধক্ষ্যের কনিষ্ঠা কন্যা মিন-গিউর-দোলমা অত্যন্ত রূপসী ছিলেন। লামা-জিগমে-পাও তার সঙ্গে রাজা গিউর-মেদ'র বিবাহের প্রস্তাব করলে সকলেই খুসী হয়ে সম্মতি দান করে। 1721 সালে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের কিছুকাল পরে মঠাধক্ষ্য সপরিবারে তাঁর মিণ্ডো-লিং গোম্পায় ফিরে যায়।

কিন্তু রাজা গিউর-মেদ-এর দাম্পত্য জীবন একেবারেই সুখের হয় নি। রাজা ও রানীর আচার আচরণের অমিল ক্রমশই তীব্র হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত জীবনের এই অশান্তি গিউর-মেদকেও ক্রমশ বহির্মুখী করে তোলে। তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ডিন-ছিন-লিং গোম্পাতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। আর রানী বার-দেন-সে রাজপ্রাসাদে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। ডিন-ছিন-লিং গোম্পাটি প্রধানত লেপচা বৌদ্ধদের দ্বারা পরিচালিত হতো। রাজা গিউর-মেদ সেখানে

কয়েকজন বুন-থিং'র (লেপচা পুরোহিত) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং লেপচাদের প্রাচীন 'বোন' ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। এতে সঙ্গত কারণেই তিব্বতী লামাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং রাজার আচরণে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। লামা জিগমে-পাও হতাশ হয়ে তিব্বতে ফিরে যান এবং সেখানেই তাঁর তিরোধান ঘটে।

রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভুটান মাঝে মাঝেই সিকিমে হানা দিতে শুরু করে। সিকিমের উত্তর-পশ্চিমে লিম্বু জাতি অধ্যুষিত লিম্বুয়ানা থেকেও আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। রাজ্যের অভ্যন্তরেও নানা জটিলতার জাল বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে একদিকে ব্যক্তিগত জীবনের অতৃপ্তি ও অসন্তোষ, অন্যদিকে রাজ্যের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তি গিউর-মেদকে প্রায় বিপর্যস্ত করে তোলে। এই অবস্থায় একদিন তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। রাজা চলে যাওয়ার পর রানী মিন-গিউর-দোলমাও তার পিতার কাছে মিণ্ডো-লিং-এ ফিরে যান এবং আর কখনও সিকিমে ফিরে আসেন নি।

নাটকের সমাপ্তি এখানেই নয়। ছদ্মবেশী গিউর-মেদ সাধারণ মানুষের মত নানা তীর্থ ঘুরে অবশেষে তিব্বতের লাসায় উপস্থিত হন। তিব্বতের কার-গিউক-পা সম্প্রদায়ের প্রধান লামা দ্বাদশ অবতার গ্যালা-করমা-পা এই ছদ্মবেশী রাজার আসল পরিচয় উদঘাটন করেন এবং তাকে যথাযথ রাজকীয় সম্মানে আতিথ্য দান করেন। করমা-পা লামার উপদেশ ও অনুরোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিউর-মেদ কিছুদিন পরে সিকিমে ফিরে আসেন ও শাসনভার গ্রহণ করেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি কার-গিউক-পা সম্প্রদায়ের জন্য সিকিমের রালং নামক স্থানে একটি গোম্পা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন (1730 খ্রীঃ)। সিকিমে কার-গিউক-পা সম্প্রদায়ের এইটিই প্রথম গোম্পা।

রাজা গিউর-মেদ'র কোন সন্তান সন্ততি ছিল না, তাঁর প্রথমা স্ত্রী, রানী মিন-গিউর-দোলমাও আর সিকিমে ফিরলেন না। সুতরাং সিকিমে ফেরার পরে রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও লামারা রাজার দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু রাজা গিউর-মেদ পুনরায় বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। অনেকের মতে, রাজা গিউর-মেদ নিবীর্য ছিলেন এবং তাই প্রথমা রানীর সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব হয় নি এবং দ্বিতীয় বিবাহ করতেও তিনি রাজী হন নি। তবে এ বিষয়ে পরবর্তী ঘটনা আরও চমকপ্রদ।

বিতর্কিত উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ফুন্তসো

তিব্বত থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই গিউর-মেদ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র 26 বছর বয়সে তিনি মারা যান (1733 খ্রীঃ)। এবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবেন তা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিল। অনেক উচ্চাভিলাষী মন্ত্রী ও প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি এই সুযোগে ক্ষমতা দখলের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। উচ্চপর্যায়ের লামারা এবং চো-গিয়ালপন্থী সরকারী কর্মচারীরা তখন এক অভিনব উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করলেন। এই সময় একজন তরুণী লামানীকে (সন্ন্যাসিনী) অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দেখা যায়। প্রধান লামারা এ বিষয়ে প্রচার করতে শুরু করলেন যে রাজা গিউর-মেদ মৃত্যুর আগে প্রধান লামার কাছে স্বীকার করে যান যে ঐ লামানীর গর্ভের সন্তান তাঁরই ঔরসজাত। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিনের মধ্যেই লামানী একটিই পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। প্রধান লামারা অবিলম্বে সেই নবজাত শিশুকে চো-গিয়াল ঘোষণা করে তার অভিষেক অনুষ্ঠান করলেন। লামানীর গর্ভজাত সেই শিশুর নাম দেওয়া হয় নাম-গিয়াল ফুন্তসো। দ্বিতীয় ফুন্তসো নামেই তিনি পরবর্তী-কালে পরিচিত হয়েছিলেন।

কিন্তু এই শিশুর জন্মের রহস্য সম্পর্কে অনেকের মনেই গভীর সন্দেহ রয়ে যায়। শিশু ফুন্তসোকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করতেও অনেকেই অস্বীকার করে। এই বিরোধীদলের নেতৃত্বে ছিলেন চাং-জোং তাম-ডিং নামে একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। এই মন্ত্রী তার সমর্থকদের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে নেন এবং নিজেকে 'গ্যাল-পো' উপাধিতে ভূষিত করে সিকিমের শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রায় তিন বছর (1738—41) তিনি সিকিমের শাসন ক্ষমতা দখল করে ছিলেন। কিন্তু শিশু ফুন্তসোর পক্ষে ছিল প্রধান লামারা এবং চাঙ-জোং কার-ওয়াং নামে একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী। চাঙ-জোং কার-ওয়াং-এর দলের সমর্থকদের শক্তি কম ছিল না। ফলে উভয় দলের বিরোধ প্রায় ঘরোয়া যুদ্ধে পরিণত হয়। তাম-ডিং আক্রান্ত ও প্রহৃত হন। প্রাণ বাঁচাতে তিনি পালিয়ে যান তিব্বতে এবং এই বিরোধের মীমাংসায় তিব্বত সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। তিব্বতের সরকারী কর্তৃপক্ষ কিন্তু শিশু ফুন্তসোকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করে, হয়তো তার জন্য লামাদের পৃষ্ঠপোষকতাই অন্যতম কারণ। যতদিন শিশু ফুন্তসো সাবালকত্ব প্রাপ্ত না হয় ততদিন শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাব-দেন-শাফে নামে তিব্বতের একজন উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারীকে সিকিমে পাঠানো হয় প্রতিনিধি হিসেবে। এই সমাধান উভয় পক্ষই মেনে নিতে বাধ্য হয়।

রাব-দেন-শাফে দীর্ঘদিন তিব্বতে সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকায় শাসন বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি সিকিমের শাসন পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতিও করেছিলেন। সিকিমে এসেই তিনি এক নতুন পদ্ধতিতে এখানকার জনসংখ্যার একটা মোটামুটি হিসেব তৈরী করেন। সে আমলে নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি পার্বত্য রাজ্যগুলিকে তিব্বতের পাথুরে লবণের উপর নির্ভর করতে হতো এবং লবণ সংগ্রহ করাই ছিল তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান লক্ষ্য। রাব-দেন-শাফে তিব্বত থেকে আসার সময় প্রচুর পরিমাণে লবণ সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি আসার পরে যখন সাধারণ প্রজারা তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে আসতো, তিনি তাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু লবণ উপহার দিতে শুরু করেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে সিকিমের অধিবাসীরা নতুন রাজ প্রতিনিধিকে দর্শন করতে আসতে লাগলো এবং প্রতিদানে লবণ সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে লাগলো। বিচক্ষণ রাব-দেন-শাফে প্রত্যেক দর্শনার্থীর নাম, ধাম, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে লিখে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে এইভাবে সিকিমের জনসংখ্যার একটি খসড়া তালিকা তৈরী হয়ে যায়। এই তালিকার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকের জমির বাৎসরিক খাজনা ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের উপরে 'জো-লুঙ' বা বাণিজ্যিক কর ধার্য করে তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। যদিও এই অবৈজ্ঞানিক আদম সুমারিতে দূরাঞ্চলের জনসংখ্যার সঠিক হিসাব নির্ণয় বা খাজনা ধার্য করার বিষয়ে কিছুটা অসম্পূর্ণতা ছিল, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাব-দেন-শাফেই সিকিমের রাজস্বের আয় ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করেন।

রাব-দেন-শাফের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি—তিনিই সিকিমের প্রথম লিখিত সংবিধান তৈরী করেন এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহ, সরকারী কর্মচারী, প্রত্যেক অঞ্চলের জোঙ-পণ (জেলা শাসক), প্রত্যেক গ্রামের পিপ্পণ (মোড়ল) প্রভৃতি ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক সম্মেলন আহ্বান করে, সকলের স্বাক্ষর সম্বলিত সেই সংবিধানকে বৈধরূপ দান করেন। এই সম্মেলন 'মঙ-শের ডুমা' নামে সিকিমের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। সংবিধানে শাসন সম্পর্কিত নীতি এবং শাসন কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন পদাধিকারী কর্মচারী, মন্ত্রী, জেলা শাসক, জমিদার, মোড়ল প্রভৃতি ব্যক্তিদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতি গৃহীত হয়। তার চেষ্টায় তিব্বত ও সিকিমের সীমান্তরেখাও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়। প্রকৃত-পক্ষে রাব-দেন-শাফেই সিকিমের শাসন ব্যবস্থাকে সুসংগঠিতরূপ দান করেন।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হলেও সিকিমের সীমান্ত এলাকায় মঙ্গার উপজাতি ভূটানের দেবরাজার সঙ্গে চক্রান্ত করে একযোগে সিকিম আক্রমণ করার চেষ্টা করে। তুচ্ছ এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গার উপজাতির নেতা রাব-দেন-শাফের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এই আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু রাব-দেন-শাফে এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা আগেই জানতে পেরে তিব্বত সরকারের সাহায্য চান এবং তিব্বতের হস্তক্ষেপের ফলে সিকিম আক্রমণ করা থেকে ভূটান সাময়িক বিরত হলেও, মঙ্গারদের সঙ্গে সিকিমের সম্পর্ক চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। সীমান্তে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় ফুন্তসো সাবালাক হলে রাব-দেন-শাফে অবসর নিয়ে তিব্বতে ফিরে যান। তিব্বত সরকার তরুণ রাজার শাসন কাজে সাহায্য করার জন্য নালু-ডিং-কারওয়া নামে অপর একজন সরকারী কর্মচারীকে সিকিমে পাঠান। এইসময় লামা কুঞ্জং-জিগমে-গ্যাৎসো সিকিমের প্রধান লামা হিসেবে আসেন। সিকিমে আবার ধর্মপ্রসারের কাজ শুরু হয়। লামা কুঞ্জং-জিগমে-গ্যাৎসোর সহায়তায় দ্বিতীয় ফুন্তসো কয়েকটি গোম্পা নির্মাণ করান, উত্তর সিকিমের জঙ্গু এলাকার তো-লুং গোম্পা এর অন্যতম। লামা কুঞ্জং-জিগমে-গ্যাৎসো সিকিমের গোম্পাগুলির জীবন-যাত্রা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করেন এবং নবীন শিক্ষানবীশ লামা ও লামানীদের বসবাসের ও আচরণবিধির নীতি নির্ধারণ করে গোম্পা জীবনে শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় ফুন্তসো ও লামা কুঞ্জং-জিগমে-গ্যাৎসোর প্রচেষ্টায় সিকিমে আবার ধর্মের আবহাওয়া গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় ফুন্তসো রাব-দেন-শাফের কন্যাকে বিবাহ করেন ; কিন্তু সন্তান সন্ততি হওয়ার আগেই রানীর মৃত্যু হয়। এরপর ফুন্তসো আরও দুবার বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান এবং তাঁর তৃতীয়া পত্নী শুধুমাত্র এক কন্যার জন্ম দেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে আবার যাতে বিরোধের সৃষ্টি না হয় এজন্য লামাদের আদেশে ফুন্তসোকে চতুর্থবার বিবাহ করতে হয়। এবার তার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে (1769 খ্রীঃ)। 1779 সালে দ্বিতীয় ফুন্তসো পরলোকগমন করলে, তেনজিং নাম-গিয়াল নামে তাঁর সেই পুত্র মাত্র এগার বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গোর্খা অভ্যুত্থান ও নেপাল-সিকিম বিরোধের সূচনা

তিব্বতের চাপে সিকিমের জ্ঞাতি শত্রু ভুটান কিছুটা অবদমিত হলেও, দ্বিতীয়

ফুন্তসোর শাসন কালের শেষ ভাগ থেকে পশ্চিম সীমান্তে আরেক নতুন শত্রু ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেপালে পৃথ্বি নারায়ণ শাহ নামে এক হিন্দু বীরের নেতৃত্বে গোর্খা জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। সমগ্র নেপাল অধিকৃত হওয়ার পর গোর্খা বাহিনী পূর্বে সিকিমের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। সিকিমের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধ না হলেও গোর্খারা মাঝে মাঝেই হঠাৎ হানা দিয়ে লুঠতরাজ ও হামলা করতে শুরু করে। সিকিমের রক্ষী বাহিনীও তাদের প্রবলভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে থাকে। একবার এক গোর্খা বাহিনী পশ্চিম সিকিমের নামচি পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এলে সিকিমের রক্ষী বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বহু গোর্খাকে হত্যা করে। সিকিমের রক্ষী বাহিনীর নেতা ছিলেন চাঙ-জোং চুঙ-থুপ। ইনি চাঙ-জোং কার-ওয়াং এর পুত্র। চাঙ-জোং চুঙ-থুপের বীরত্বের পরিচয় পেয়ে গোর্খারা তার নাম দিয়েছিল 'সত্রাজিৎ' অর্থাৎ যে সাত যুদ্ধে জয়ী। এই রক্ষাবাহিনীর চেষ্টায় গোর্খাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হলেও তাদের হামলা অব্যাহত ছিল।

1775 সালে পৃথ্বি নারায়ণ শাহর মৃত্যু হলে তার পুত্র প্রতাপ নারায়ণ শাহ নেপালের রাজা হন এবং এই নবগঠিত জাতির নেতৃত্ব দান করেন। প্রতাপ নারায়ণ পিতার আরব্ধ কাজের দায়িত্ব নিয়ে গোর্খাদের অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে লাগলেন। নেপালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিগুলি ক্রমশ গোর্খাদের পতাকা তলে সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগলো। গোর্খারা ছিল অত্যন্ত সাহসী ও কুশলী যোদ্ধা। শোনা যায়, পশ্চিম ভারতের শতদ্রু নদী পর্যন্ত তারা অধিকার বিস্তার করেছিলো। সিকিমেও বার বার হামলা করে কিছু কিছু জায়গা তারা দখল করে নেয় এবং পশ্চিম সীমান্তে অরুণ নদী পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। গোর্খাদের এই আগ্রাসনের ফলে সিকিমের বেশ কিছু অঞ্চল হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াতে সিকিমের রক্ষী বাহিনী তাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। উভয়পক্ষেরই বহু জীবন হানি হয়। এমন কি সিকিমের সেনাধ্যক্ষ চাঙ-জোং চুঙ-থুপ-ও প্রচণ্ড আহত হয়ে কোন প্রকারে প্রাণে রক্ষা পান। বহু রক্তপাতের পর নেপাল-সিকিম সীমা নির্ধারণের বিষয়ে উভয় পক্ষই বোঝাপড়া করতে রাজী হয় এবং তিব্বত সরকারকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ জানায়। 1775 সালে একটি ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। গোর্খারা সিকিমের অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হয় কিন্তু বিনিময়ে সিকিমের রক্ষী বাহিনী যে চারজন ব্রাহ্মণ গোর্খাকে হত্যা করেছিল তাদের রক্তমূল্য হিসেবে ক্ষতিপূরণ দাবী করে। সিকিম

সরকার গোর্খাদের দাবী মেনে নিয়ে সেই অর্থ প্রদান করে। চুক্তিতে উভয়পক্ষই শান্তি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও নেপাল-সিকিম সীমান্তে ছোট খাট সংঘর্ষ প্রায় অব্যাহতই ছিল। তেনজিং নাম-গিয়াল সিংহাসনে আরোহণ করার পর শাসন কার্যে দক্ষতা অর্জন করার আগেই বহিঃশত্রুর আক্রমণে তাঁর জীবন বিব্রত হয়ে ওঠে। গোর্খারা ইতিমধ্যে সিকিম ও নেপালের মধ্যবর্তী লিম্বু রাজ্য 'লিম্বুয়ানা' জয় করে নেয়। ফলে এবার তারা উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম উভয় দিকের গিরিপথ দিয়ে সিকিমে প্রবেশ করতে শুরু করে। সিকিমে সেনাধ্যক্ষ চুঙ-থুপ এবং অপর একজন সেনাধ্যক্ষ দেব-চাঙ-রিণ-জিং এর নেতৃত্বে রক্ষী বাহিনীর দুটি দল গঠন করা হয়। এই দুই রক্ষী দল উভয় সীমান্তে প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্বেও গোর্খারা দক্ষিণে চাকুং ও নামচি এবং উত্তরে রঙ্গীত নদী অতিক্রম করে চুঙ-থাঙ পর্যন্ত অধিকার করে নেয়। প্রকৃত পক্ষে গোর্খাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে সিকিম সরকারের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই পরবর্তী ঘটনার জন্য তারা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। স্বল্প-শক্তি এই রক্ষী বাহিনীর পক্ষে সিকিম রক্ষা করা যে নিতান্তই অসম্ভব, সে বিষয়ে কেউই সচেতন হয় নি। তাই সিকিমের অভিভাবক দেবতা 'খাঙ-চে-জো-ঙ্গা'র অগোচরে ভাগ্য দেবতা সিকিমকে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

ষষ্ঠ চো-গিয়াল—তেনজিং

তেনজিং নাম-গিয়াল চাঙ-জোং কার-ওয়াং-এর কন্যা তথা সেনাধ্যক্ষ চুঙ-থুপের বৈমাত্রেয় বোনকে বিবাহ করেন। 1785 সালে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু সুখে শান্তিতে রাজত্ব করার সৌভাগ্য নিয়ে তেনজিং জন্মগ্রহণ করেন নি। শিশুকাল থেকেই রাজ্যের সঙ্কটময় আবহাওয়ায় তাঁর দিন অতিবাহিত হয়েছে। তাই গোর্খাদের বিষয়ে আতঙ্ক তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গী হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের দুর্বল শক্তি নিয়ে দেশের প্রতিরক্ষার চিন্তা করলেও, বৃহত্তর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোন প্রস্তুতি তিনি নেন নি। 1788-89 সালে জহর সিং নামে একজন গোর্খা সেনাপতি চিয়া-ভঞ্জন গিরিপথ দিয়ে সদলবলে সিকিমে প্রবেশ করে ও গভীর রাতে অতর্কিতে নিদ্রিত রাব-দেন-সে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। রাজা তেনজিং নাম-গিয়াল তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন লামা ও অনুচরের সাহায্যে কোনক্রমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। পালাবার সময় তারা

কেবলমাত্র প্রাণটুকু সম্বল করে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, আর কিছুই সঙ্গে নিতে পারেন নি। শোনা যায়, পালানোর মুহূর্তে রানী শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেবতার একটি মুখোশ দেওয়াল থেকে খুলে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। বিপদ সঙ্কুল পার্বত্য পথ অতিক্রম করে তাঁরা পূর্ব সিকিমের কাবি-রিঙ-চোমের কাছে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করেন। গোর্খাদের অত্যাচারে সিকিমের ভুটিয়া-লেপচা অধিবাসীরা পাহাড়ের গুহায় ও বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। রাব-দেন-সে রাজপ্রাসাদ ও তার আশেপাশের বিস্তৃত এলাকা গোর্খাদের দখলে চলে যায়। জহর সিং পশ্চিম সিকিমের তিস্তা উপত্যকায় এক বিশাল সামরিক শিবির স্থাপন করে শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরী করে ও রাজ্যে কায়েম হয়ে বসে।

রাজা তেনজিং নাম-গিয়াল কাবি-রিঙ-চোমের সেই গভীর জঙ্গলে কয়েকজন মাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে চরম দুরাবস্থার মধ্যে দিন যাপন করতে থাকেন। বনের ফলমূল ও শাকপাতা খেয়ে তাঁদের প্রাণ ধারণ করতে হয়। তেনজিং-এর অনুচরেরা জঙ্গল থেকে মেজেণ্টা রঙ করার পাতা সংগ্রহ করে তিব্বতের ফারীতে গিয়ে বিক্রী করতে আরম্ভ করে এবং ফারী থেকে লবণ ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে এনে রাজ-পরিবারের জীবন ধারণের অতি নিম্নতম চাহিদাটুকু মেটানোর চেষ্টা করে। এই সময় ভুটানের দেবরাজা প্রতিবেশী এই রাজা তথা ধর্ম ভাই-এর দুরবস্থার কথা জানতে পেরে দয়াপরবশ হয়ে তেনজিং নাম-গিয়ালের কাছে অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাহায্য পাঠান। হয়তো বৌদ্ধধর্মের শিক্ষানুসারে বিপদগ্রস্থ ও স্বধর্ম পালনকারী রাজার প্রতি এই অনুকম্পা প্রদর্শন করা হয়েছিল। তবে গোর্খাদের দমন করার ব্যাপারে ভুটানেরও সমান স্বার্থ জড়িত ছিল।

কিন্তু এইভাবে জীবন যাপন করা তেনজিং নাম-গিয়ালের পক্ষে সম্ভবও ছিল না এবং এর কোন সার্থকতাও ছিল না। অথচ রাজ্য উদ্ধার করার মত অর্থবল বা সৈন্যবল কিছুই তাঁর ছিল না। তাঁর সামনে একটিই মাত্র রাস্তা খোলা ছিল—তিব্বত সরকারের আশ্রয় নিয়ে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করা। অবশেষে এক বছরেরও বেশী সময় এইভাবে কষ্ট সহ্য করার পর, লামা ও বিশ্বস্ত অনুচরদের পরামর্শে তেনজিং কয়েকজন মাত্র সঙ্গীকে নিয়ে, রানী ও শিশু পুত্রের হাত ধরে, ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে লাসায় উপস্থিত হন (1790 খ্রীঃ)।

সিকিমের সেনাধক্ষ্য চুঙ-থুপ একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিলেন না। তিনি গোপনে শক্তি সঞ্চয় করে গোর্খাদের সিকিম থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছিলেন। কিন্তু গোর্খাদের তুলনায় তাঁর অর্থবল বা জনবল কিছুই ছিল না। এই সময় তেনজিং নাম-গিয়ালের অনুরোধে লাসা সরকার গোর্খাদের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার জন্য কয়েকজন প্রভাবশালী তিব্বতী প্রতিনিধিকে সিকিমে পাঠায়। এ বিষয়ে ভুটানের দেবরাজাকেও সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানালে, ভুটান থেকেও কয়েকজন প্রতিনিধি সিকিমে আসে। এরপর তিব্বত ও ভুটানের প্রতিনিধিরা জহর সিং-এর সঙ্গে আলোচনা করে তার গোর্খা বাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়ে রাব-দেন-সে রাজপ্রাসাদ অবিলম্বে মুক্ত করে দেবার জন্য চাপ দেন। জহর সিং তিব্বত ও ভুটান, এই যৌথ চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তার সৈন্যবাহিনী অপসারিত করে রাব-দেন-সে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু গোর্খাদের এইভাবে বিনাশর্তে নীরবে সিকিম ছেড়ে যাওয়ার পিছনে যে অন্য উদ্দেশ্য ছিল তা তখন কোনপক্ষই উপলব্ধি করতে পারে নি। রাজ্য ফিরে পাওয়ার আনন্দে সিকিমের অধিবাসীরা তাদের রাজা তেনজিংকে ফিরিয়ে আনার জন্য দূত পাঠায় তিব্বতে। কিন্তু সেই দূত তিব্বতে পৌঁছানর আগেই ঘটনার গতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়।

গোর্খাদের তিব্বত আক্রমণ এবং চীনের মধ্যস্থতা

1791 খ্রীষ্টাব্দের শুরুতেই দুঃসাহসী গোর্খা বাহিনী এবার সরাসরি তিব্বত আক্রমণ করে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য তিব্বত সরকারও প্রস্তুত ছিল না। তাই প্রথম দিকে গোর্খারা প্রায় 275 মাইল নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তাসী-ল্হানপো গোম্পা লুঠতরাজ করে বিপুল ক্ষতিগ্রস্থ করে। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই তিব্বত সরকার গোর্খাদের এই দুঃসাহস দমন করতে প্রবলভাবে পাল্টা আক্রমণ করে। তিব্বতের সাহায্যে সিকিমের সেনাধ্যক্ষ চুঙ-থুপও তার রক্ষী বাহিনীকে নিয়ে নেপাল-সিকিম সীমান্তে এগিয়ে যায় এবং গোর্খাদের গতিরোধ করার জন্য বাধা দিতে থাকে। এই সময় তিব্বতে অবস্থিত চীনের 'আমবান' (রাজদূত) জেনারেল হো সী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে তিব্বতের পাশে এসে দাঁড়ায়। চীনা সৈন্যরা যে শুধু যুদ্ধ কৌশলে পারদর্শী ছিল তাই নয়, তাদের কাছে উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্রও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং চীন, তিব্বত ও সিকিমের এই সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মত শক্তি ও সাহস গোর্খাদের পক্ষে ছিল নিতান্তই হঠকারিতা। চরম পরাস্ত গোর্খারা একেবারে নেপালের অভ্যন্তরে পিছু হটে যায় এবং নিঃসর্ত শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। শান্তি চুক্তি আলোচনায়

চীনের প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল হো সী নেতৃত্ব করেন। এই চুক্তিতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, আক্রমণ থেকে বিরত থাকা, পারস্পরিক মৈত্রী এবং সহযোগিতা বজায় রাখা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হলেও রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করার বিষয়টি একেবারে উপেক্ষিত হয়। বিশেষত এই চুক্তি আলোচনার সময় সিকিমের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায়, তার স্বার্থের প্রতি সঠিক দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বলে সিকিমবাসীরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়। গোর্খা অধিকৃত সিকিমের অঞ্চলগুলি মুক্ত করার বিষয়ে কোন মীমাংসাই হয় নি চুক্তিতে। উপরন্ত পূর্বে চুম্বী উপত্যকায় তিব্বতের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। এমন কি ষষ্ঠ দালাই লামা তৃতীয় চো-গিয়াল চাক-দর নাম-গিয়ালকে যে দুটি তালুক দান করেছিলেন, তাও তিব্বত সরকার নিজেদের অংশ হিসেবে দাবী করে নেয়। স্বাভাবিকভাবেই সিকিমের ভৌগলিক আয়তন ক্ষুদ্রতর হয়ে যায়। কিন্তু দুর্বল সিকিমের নীরবে চুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, এটিকে বিজয়ী চীন এবং বিজিত গোর্খাদের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি[1] বলা হয়ে থাকে। সিকিমের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই প্রথম চীনের আবির্ভাব ঘটলো।

সিকিমের সরকারী কর্মচারীরা, ভূ-স্বামীরা অথবা লামারা কেউই এই শান্তি চুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তেনজিং নাম-গিয়ালও লাসা সরকারের কাছে আবেদন জানান কিন্তু লাসা সরকার আসল সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে গোর্খারা সিকিমের যে সমস্ত গোম্পার ক্ষতি করেছিল, সেগুলিকে পুনর্গঠন করার জন্য কিছু অনুদান পাঠিয়ে সিকিমবাসীদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। সিকিমের এই ব্যবস্থাই মেনে নিতে হল।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, গোর্খারা বিতাড়িত হলেও তেনজিং নাম-গিয়াল আর সিকিমে ফিরে আসতে পারেন নি। লাসাতে থাকতেই তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন (1793 খ্রীঃ)। তাঁর আট বছর বয়স্ক পুত্র চুগ-ফুদকে সিকিমে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। সিকিমের ইতিহাসেও এই সময় থেকে নতুন পট পরিবর্তন শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সিকিমের ভাগ্যাকাশেও উদয় হয় অন্য এক বিশাল গ্রহ। সেই গ্রহ এই ধর্মকেন্দ্রিক রাজ্যটিকে কোন পথে নিয়ে যায় দেখা যাক। □

---

1. Sino-Nepalese Treaty

দুই

ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের যুগ

ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতার ভিত পাকা হওয়ার পরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের পার্বত্য রাজ্যগুলির দিকে হস্ত প্রসারিত করতে মনস্থ করে। বিশেষত, স্বর্ণ ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইংরেজ সরকারের বরাবরই ছিল লোলুপ দৃষ্টি। কিন্তু তিব্বতে প্রবেশের কোন সহজ পথ ছিল না। একমাত্র সিকিম ও ভুটানের মধ্য দিয়ে অথবা নেপাল হয়ে ঘোরাপথে তিব্বতে পৌঁছানো সম্ভব ছিল। স্বাভাবিকভাবেই সিকিমের প্রতি ব্রিটিশদের আগ্রহ তীব্র হয়ে ওঠে। ইংরেজদের পক্ষে সিকিমের দুর্বল ও অসহায় অবস্থার কথা উপলব্ধি করতে দেরী হয় নি—পশ্চিমে নেপালের হিন্দুধর্মী গোর্খারা তাদের পরম শত্রু, পূর্বে ভুটানের সঙ্গেও তার সদ্ভাব নেই, এমন কি চীন-নেপাল শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পিতৃপ্রতিম তিব্বতের এতদিনকার অভিভাবকত্বের প্রতিও তার আস্থা ক্ষীণতর হয়ে গিয়েছে। এমন একটি হীনবল, ক্ষুদ্র রাজ্যকে বল প্রয়োগ করে অধিকার করা ইংরেজ সরকারের কাছে ইঁদুর শিকারে অস্ত্রক্ষয় করার সামিল। তাছাড়া সিকিম আক্রমণ করলে তিব্বত ও চীনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারতো। সুতরাং কৌশলে সিকিমকে ব্রিটিশ পক্ষপুটে নিয়ে এসে বৃহত্তর স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিরা টোপ ফেলতে লাগলেন।

অন্যদিকে নেপালের গোর্খারা চীন ও তিব্বতের কাছে আঘাত খেয়ে দক্ষিণে সমতল ভূমির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। 1814 সালে গোর্খারা সিকিমের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় "নাগরি জোঙ" আক্রমণ করে ও মেচি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত তরাই অঞ্চল অধিকার করে নেয়। সিকিমের তরুণ রাজা চুগ-ফুদ এবার সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। ব্রিটিশ সরকার এই সুযোগেরই

অপেক্ষা করছিল। তাই অবিলম্বে মেজর চার্লির অধীনে এক সৈন্যবাহিনী গোর্খাদের দমন করার জন্য সিকিমে পাঠানো হয়। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা গোর্খাদের ছিল না, সুতরাং তারা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সেগৌলি নামক স্থানে 1816 সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়[1]। এই চুক্তিতে গোর্খারা ভবিষ্যতে সিকিমের রাজাকে বিরক্ত না করার অঙ্গীকার করে এবং তিস্তা ও মেচি নদীর মধ্যবর্তী গোর্খাদের অধিকৃত বিস্তৃত অঞ্চল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সমর্পন করে। চুক্তির অন্যতম সর্ত ছিল যে এর পর নেপাল ও সিকিমের মধ্যে যদি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে তা বাধ্যতামূলকভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সালিশীর জন্য পাঠাতে হবে। সিকিম ও নেপাল উভয়েরই এই সর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এবার সিকিমকে কুক্ষিগত করার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল সিকিমের রাজার সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি করার প্রস্তাব দিয়ে মেজর ব্যারে-কে পাঠান। প্রস্তাবের গূঢ় উদ্দেশ্য বোঝা সিকিম রাজার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 1817 সালে তাই বিখ্যাত 'তিতালিয়া চুক্তি' সম্পাদিত হল ইংরেজ সরকার ও সিকিম সরকারের বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন করে[2]। সিকিম সরকারের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনে প্রতিনিধিত্ব করেন পেমা-ইয়াংসি গোম্পার লামা তিন-চেন-লঙ-দু, চেন-ই-তেনজিং এবং মা-চেন-টেম্পো নামে রাজার একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী। ইংরেজ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন মেজর ব্যারে। মৈত্রীর প্রতীক উপহার হিসেবে সেগৌলি চুক্তিতে তিস্তা ও মেচি নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য এলাকা যা গোর্খারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সমর্পণ করেছিল তা সিকিম রাজাকে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু এর ফলে গোর্খাদের দখল করা পূর্ব সিকিমের জমির আংশিক উদ্ধার হয় মাত্র। তাই সিকিমের রাজা তথা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা কেউই এই চুক্তিতে সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করতে পারেন নি। এর পরে অবশ্য সিকিমের প্রতি অবিচারের কথা বিবেচনা করে গভর্নর জেনারেল গোর্খাদের কাছ থেকে মেচি ও মহানদীর মধ্যবর্তী মোরাঙ্গ নামের ভূখণ্ডটি উদ্ধার করে সিকিমকে ফেরত দেন।

সপ্তম চো-গিয়াল চুগ-ফুদ ঃ ব্রিটিশ কূটনীতি ও আভ্যন্তরীণ সমস্যার শিকার

ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সহায়তার আশ্বাস পেলেও রাজা চুগ-ফুদ গোর্খাদের

1. Treaty of Segouli,—1816
2. Treaty of Titalia, 10 February, 1817

সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। এজন্য তিনি রাব-দেন-সে থেকে সিকিমের উত্তর-পূর্বে তুম-লং নামক স্থানে নূতন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করান এবং সেখানে রাজদরবার স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু রাব-দেন-সে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করা অনেক লামা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ঠিক মনঃপূত হয় নি। এ ব্যাপারে রাজার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী চাঙ-জোৎ বো-লোৎ-এরই উৎসাহ ছিল বেশী এবং তিনিই রাজাকে তুম-লং এ চলে আসার জন্য প্ররোচিত করেন। এর পরিণাম পরে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

রাজা চুগ-ফুদ তিব্বতের কোন অভিজাত মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছায় লাসা সরকারের কাছে প্রস্তাব করে চিঠি পাঠান। সিকিমের সঙ্গে মনমালিন্য দূর করার এই সুযোগ পেয়ে লাসা সরকার তিব্বতের অভিজাত 'ল্হামই' পরিবারের এক কন্যার সঙ্গে রাজা চুগ-ফুদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে দেয় এবং বিবাহের সময় প্রচুর যৌতুক দিয়ে তাকে খুসী করে। এছাড়া চুম্বীতে সিকিমের রাজ পরিবারের ও অন্যান্য ভূ-স্বামীদের যে গ্রীষ্মকালীন আবাস ছিল সেখানে তাদের পুনরায় বসবাস করার অনুমতি দিয়ে রাজা তথা অন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অসন্তোষ দূর করতেও সমর্থ হয়। ধীরে ধীরে তিব্বতের সঙ্গে সিকিমের সম্পর্ক আবার সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু রাজা চুগ-ফুদের প্রথমা রাণী এক কন্যা ও এক পুত্রের জন্মের পরেই মারা যান। রাজা তাই প্রথমা রাণীর ভগ্নীকেই বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ-কীয়ং 1819 সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই রাজা চুগ-ফুদের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। প্রথমা রাণীর পুত্র অবতার রূপে পরিগণিত হন এবং শৈশবেই লামাত্ব গ্রহণের জন্য তাকে গোম্পায় পাঠান হয়। দ্বিতীয়া রাণীরও দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সময় অকাল মৃত্যু ঘটে। শোনা যায়, এরপর আবার চুগ-ফুদ প্রথমা রাণীর অপর দুই ভগ্নীকেও বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু উভয়েই নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। বার বার পত্নী বিয়োগের ফলেই হয়তো রাণীর এক অনুচরীর সঙ্গে রাজা চুগ-ফুদের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তার গর্ভে রাজার অবৈধ একটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মলাভ করে। পেমা-লা নামে সেই কন্যা ও তেনজিং নামগিয়াল নামে পুত্র পরবর্তী কালের ঘটনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তুম-লং-এ রাজদরবার স্থানান্তরিত করার পর থেকেই সিকিমের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী চাঙ-জোৎ বো-লোৎ ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চাঙ-জোৎ কার-ওয়াং-এর পুত্র এবং সম্পর্কে রাজা চুগ-ফুদের মামা। স্বভাবতই তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম, যা অন্যান্য মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে। রাজপ্রাসাদ স্থানান্তরের সময় প্রধানমন্ত্রী

বো-লোৎ বহু মূল্যবান দ্রব্য সরিয়ে আত্মসাৎ করেছেন বলে অনেকের ধারণা হয়। তা ছাড়া রাজার দ্বিতীয়া পত্নীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়েও নানা রকম কুৎসা রটনা চলেছিল। রাজা চুগ ফুদও শেষদিকে প্রধানমন্ত্রীকে সন্দেহ করতে শুরু করেন এবং উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ শুরু হয়। প্রথম কয়েকবার এই মনান্তর মিটিয়ে নিলেও পরে তা চরম আকার ধারণ করে। রাজার কিছু কিছু পরামর্শদাতা তাঁর কানে বিষ ঢালতে থাকেন যে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দুর্নীতি গ্রস্ত—সিকিমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রজারা রাজার জন্য যে সমস্ত উপহার সামগ্রী নিয়ে আসে তা রাজপ্রাসাদে পোঁছনোর আগেই মাঝপথে প্রধানমন্ত্রীর লোকজন ছিনিয়ে নেয়। এই সময় তুঙ-ইক-মেনচু নামে একজন স্বার্থান্বেষী ভুটিয়া কর্মচারী রাজাকে আরও উত্তপ্ত করে তুলে বলে যে প্রধানমন্ত্রী বো-লোৎ রাজাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করছেন। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী বো-লোৎ জাতিতে লেপচা ছিলেন, তাই রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর এই বিরোধ শেষে লেপচা-ভুটিয়া বিরোধে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে এবং দ্বি-জাতিক দলে বিভক্ত হয়। এরপর তুঙ-ইক-মেনচুর নেতৃত্বে একদল ভুটিয়া একদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী বো-লোৎ-এর গৃহে চড়াও হয়ে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার স্ত্রী এবং পুত্রদেরকেও হত্যা করা হয়। এমন কি বো-লোৎ'-এর অপর দুই ভাই পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও ভুটিয়াদের হাত থেকে রেহাই পায় নি, বল্লমের আঘাতে তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সিকিমের উচ্চ পর্যায়ের লামারা ও বিবেকশীল ব্যক্তিরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন। রাজা চুগ-ফুদও এই চরম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষ করে এই ঘটনার ফলে লেপচাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। লেপচা-ভুটিয়ার মিলন সেতুতেও বিরাট ফাটল দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী বো-লোৎ'-এর ভাই কুঙ-গা কোটা অঞ্চলের জোঙ-পন অর্থাৎ জেলা শাসক ছিলেন। কুঙ-গা'র পুত্র ইয়ুক-লা-রূপ কাকা বো-লোৎ ও তার পরিবারের এই হত্যার প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করে। সিকিমের প্রায় আট শত লেপচা পরিবারকে নিয়ে নেপাল সীমান্তে 'ইলাম' নামক স্থানে গিয়ে নেপালের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় মাঝে মাঝেই সে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিকিমে প্রবেশ করে ভুটিয়া অধিবাসীদের উপর হামলা করতে থাকে। বহু ভুটিয়ার প্রাণহানি ও সম্পত্তি নাশ হয়। এতগুলি লেপচা পরিবার রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে রাজস্ব ও উৎপাদনেও প্রভূত ক্ষতি হয়। রাজা চুগ-ফুদ অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং লেপচাদের সঙ্গে বিরোধ মেটানোর জন্য ইয়ুক-লা-রূপ' এর কাছে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে শান্তির আবেদন করেন। কিন্তু

লেপচারা ভুটিয়াদের উপর এতই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল যে সিকিমে ফেরার প্রস্তাব তারা প্রত্যাখান করে। ভুটিয়াদের উপর লেপচাদের হামলাও অব্যাহত থাকে। এই সময় মেচি নদীর তীরে 'উন্টু' পাহাড়ের অধিকার নিয়ে আবার নেপালের সঙ্গে সিকিমের বিরোধ শুরু হয়। সুতরাং রাজা চুগ-ফুদ উপায়ান্তর না দেখে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল তখন লর্ড বেন্টিঙ্ক। জেনারেল লয়েড এবং মালদহ জেলার বাণিজ্য প্রতিনিধি মিঃ গ্রান্টকে তিনি সমস্যা পর্য্যালোচনা করার জন্য সিকিমে পাঠান। লয়েড (তখন ক্যাপ্টেন) ইয়ুক-লা-রূপ তথা লেপচাদের সঙ্গে সিকিম রাজার বিরোধের সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হন। প্রায় সমস্ত লেপচা প্রজাই আবার সিকিমে ফিরে আসে। তাদের মাতৃভূমিতে আবার ফিরে আসতে পেরে লেপচারা সকলেই খুশী হয় এবং এরপর ভুটিয়াদের সঙ্গেও ধীরে ধীরে তাদের সদ্ভাব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়।

দার্জিলিং-এর আদি কথা

জেনারেল লয়েড এই অঞ্চলে ভ্রমণ করার সময় সিকিমের অন্তর্গত ছোট্ট এক পাহাড়ী গ্রাম, যার নাম ছিল 'দোর্জে-লিং' অর্থাৎ বজ্রের দেশ (দোর্জে=বজ্র, লিং=পাহাড়) দেখে খুবই মুগ্ধ হন এবং জায়গাটি সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেল তথা ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই গ্রামটি পাওয়া গেলে শুধুমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী বা ইংরেজ অধিবাসীদের গ্রীষ্মাবাসের পক্ষেই যে উপযুক্ত হবে তাই নয়, এখানে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য রাজ্যগুলির প্রতি নজর রাখাও সুবিধে হবে। লয়েডের এই পরিকল্পনা যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অত্যন্ত লোভনীয় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং গভর্ণর জেনারেলও অবিলম্বে দোর্জে-লিং গ্রামটি ক্রয় করার প্রস্তাব দিয়ে রাজা চুগ-ফুদকে চিঠি লিখলেন। রাজা চুগ-ফুদ এই গ্রামটি এভাবে হাতছাড়া করতে প্রথমে রাজী হন নি। তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের বা লামাদেরও এতে সম্মতি ছিল না। কিন্তু 'উন্টু' পাহাড়ের অধিকার নিয়ে নেপালের সঙ্গে বিরোধের প্রশ্নটি তিতালিয়া চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সালিশীর জন্য পাঠাতে বাধ্য হতে হয়। সেই সময় গভর্ণর জেনারেল আবার ঐ গ্রামটির জন্য সিকিম রাজাকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। গ্রামটির জন্য প্রয়োজনীয় যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ দেবার কথাও চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু সিকিম সরকারের

পক্ষে এই অনুরোধ সহজে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আবার জেনারেল লয়েডকে সিকিমে পাঠানো হয়। জেনারেল লয়েড রাজা চুগ-ফুদকে বোঝালেন যে একমাত্র স্বাস্থ্য নিবাস তৈরী করার উদ্দেশ্যেই তাঁর সরকার এই জায়গাটির প্রতি বিশেষ আগ্রহী। অবশেষে 1835 সালে এক দানপত্র অনুসারে (Deed of Grant) 'দোর্জে-লিং' গ্রামটি ব্রিটিশ সরকারকে সমর্পণ করা হয়। কিন্তু উভয় জাতির ভাষা সমস্যা অথবা বক্তব্যের অস্পষ্টতার জন্য এ বিষয়ে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। দানপত্রে লেখা হয় যে নিঃসর্ত উপহার হিসেবে জায়গাটি ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হয়েছে। অথচ এর জন্য রাজা চুগ-ফুদ দুটি সর্ত আরোপ করেছিলেন, এক গোর্খা-অধিকৃত দেবগাঁও সিকিমকে ফেরৎ দিতে হবে এবং মোরাঙ্গ অঞ্চলের নেপালী প্রজা রামু প্রধানকে তার সমস্ত বাকী খাজনা মিটিয়ে দিয়ে উৎখাত করতে হবে। সর্ত দুটি সম্পর্কে দানপত্রে কোনই উল্লেখ ছিল না। অনেকে মনে করেন, জেনারেল লয়েড এ বিষয়ে যে চাতুরী করেছিলেন রাজা চুগ-ফুদ তা ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। রাজার ভুল ভাঙলো যখন গভর্ণর জেনারেল তাঁকে এই দানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাজা চুগ-ফুদ প্রতিবাদ জানিয়ে গভর্ণর জেনারেলকে চিঠি লেখেন। দীর্ঘ বাদ-প্রতিবাদের পর শেষে ব্রিটিশ সরকার সিকিম রাজাকে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা অনুদান বা খাজনা হিসেবে দিতে স্বীকৃত হয়। 1841 সালে প্রথম অনুদানের অর্থ দেওয়া হয় এবং 1835 সাল থেকে সমস্ত বকেয়া প্রাপ্যও শোধ করে দেওয়া হয়। 1846 সাল থেকে এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা করা হয়।

দোর্জে-লিং গ্রামটি ব্রিটিশদের কাছে সমর্পণ করার ব্যাপারটি তিব্বত তথা লাসা সরকার প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। ইংরেজদের সম্বন্ধে তারা প্রথম থেকেই অত্যন্ত সন্দিহান ছিল। এখন সিকিমের মধ্যে তাদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে তিব্বত সরকার আরও বেশী সচেতন হয়ে উঠল। সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সিকিমের সঙ্গেও তিব্বত দূরত্ব রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। এজন্য সিকিমের রাজাদের তিব্বত পরিদর্শনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা পাঠানো হয় এবং আট বছর অন্তর একবার এ বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। সিকিম তিব্বত সীমান্তের বিস্তৃত চারণভূমিতে এতদিন উত্তর সিকিমের লাচুং-পা ও লাচেন-পা' রা (লাচুং ও লাচেনের অধিবাসী ভুটিয়া) যে পশুচারণের সুবিধে ভোগ করছিল তাও নিষিদ্ধ করে সীমান্ত রক্ষা জোরদার করা হয়। সিকিম এবার স্পষ্টতই তিব্বতের সাহায্য এবং সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হল।

এই দোর্জে-লিং গ্রামই বর্তমানের দার্জিলিং। ব্রিটিশ সরকার দার্জিলিং এর অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জায়গাটির উন্নতির জন্য তৎপর হয়ে উঠল। 1836-37 সালে যে গ্রামের জনসংখ্যা একশ জনের বেশী ছিল না, 1849 সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দশ হাজারেরও বেশী দাঁড়ায়। এই দ্রুত বসতির অন্যতম কারণ হল, সিকিম ভুটান ও নেপালের দরিদ্র অধিবাসীরা, যারা এতদিন প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে বেগার ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতো, তারা দলে দলে ইংরেজদের অধীনে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য এই নতুন দেশে চলে আসতে লাগল। বিভিন্ন কাজের জন্য পাশ্ববর্তী উত্তরবঙ্গ থেকেও শিক্ষিত বাঙালীদের দার্জিলিং-এ বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করা হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার এই নতুন অধিবাসীদের নানা রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে আকর্ষণ করতে লাগল। বনজ সম্পদ এবং বিনা শুল্কে ব্যবসা করার সুযোগ এখানে বসবাস করার অন্যতম প্রলোভন ছিল। ফলে, মাত্র দশ বছরের মধ্যে দার্জিলিং এক নতুন রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠলো চা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ সরকার দার্জিলিং-এ একটি সামরিক ঘাঁটিও স্থাপন করে।

দেওয়ান নাম-গিয়াল বনাম ব্রিটিশ সরকার

দার্জিলিং-এর উন্নতি সিকিমের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠলো। বিশেষত, সিকিমের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র অধিবাসী দার্জিলিং-এ গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে আরম্ভ করায় সিকিমে কৃষক ও শ্রমিকের সংখ্যাও কমে যেতে লাগল। স্বাভাবিক কারণেই, সিকিম সরকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এইসময় রাজা চুগ-ফুদের মন্ত্রী পরিষদে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন তো-কাঙ-দোনীয়ার, যিনি পাগলা দেওয়ান বা দেওয়ান নাম-গিয়াল নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ইনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বো-লোৎ-এর হত্যাকারী ভুটিয়া তুঙ-ইক-মেনচু'র পুত্র। দেওয়ান নাম-গিয়াল অত্যন্ত চতুর ও কঠোর চরিত্রের লোক ছিলেন। রাজার অবৈধ কন্যা পেমা-লাকে বিবাহ করার জন্য তার প্রভাব প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। দেওয়ান নাম-গিয়াল নিজেও ছিলেন একজন ধনশালী 'কাজী' বা সামন্ত প্রভু। বেগার কৃষক শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তার ব্যক্তিগত স্বার্থেও আঘাত লাগে। তাই যে সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক দার্জিলিং-এ গিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল, দেওয়ান নাম-গিয়াল তাদেরকে পলাতক অপরাধী বলে ঘোষণা করে অবিলম্বে সিকিমে ফেরৎ পাঠানর জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবী জানান। শুধু তাই নয়, এই দেশত্যাগী

কৃষক ও শ্রমিকদের মাঝে মাঝেই দার্জিলিং থেকে গুম করে এনে সিকিমে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করা হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার দেওয়ান নাম-গিয়ালকেই সেই অপকর্মের নায়ক বলে মনে করে এবং তাকে এইধরণের কুকর্মের বিষয়ে সাবধান করে দেয়। কিন্তু দেওয়ান নাম-গিয়ালের অনমনীয় স্বভাবের জন্য পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সিকিমের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে যায়।

1849 সালে ব্রিটিশ সরকার বিশিস্ট ভূতত্ত্ব এবং উদ্ভিদবিদ স্যার জোসেফ হুকারকে হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও তথ্যানু-সন্ধানের জন্য সিকিমে পাঠাতে মনস্থ করে। দার্জিলিং-এর তৎকালীন সুপারিনটেণ্ডেন্ট ডাঃ ক্যাম্পবেল রাজা চুগ-ফুদের কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন। প্রথমে রাজী না হলেও, বার বার অনুরোধের চাপে রাজা চুগ-ফুদ তাদেরকে সিকিমে ভ্রমণের অনুমতি দেন। হুকার-এর সঙ্গে ক্যাম্পবেলও সিকিমে আসেন। তার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল যে সিকিমের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাজার মতানৈক্য দূর করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু দেওয়ান নাম-গিয়াল রাজা চুগ-ফুদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের কোন সুযোগই দিলেন না।

সিকিমে পরিভ্রমণ করার সময় হুকার ও ক্যাম্পবেল তিব্বত-সিকিম সীমান্তের চো-লা গিরিপথ অতিক্রম করে চুম্বী উপত্যকায় প্রবেশ করেন। কিন্তু তাদের চুম্বী পর্যন্ত যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই খবর পাওয়া মাত্র রাজা কয়েকজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে তাদের গতিপথে বাধা দেন এবং উভয়কেই সিকিমে নিয়ে এসে বন্দী করেন। এ ব্যাপারেও পাগলা দেওয়ানের প্ররোচনা ছিল নিঃসন্দেহে। পাগলা দেওয়ান বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে সিকিমের যে অধিবাসীরা চলে গিয়ে দার্জিলিং-এ বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে ফেরৎ পাঠাবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবী জানান। বন্দীদের উপরে দেওয়ান নাম-গিয়াল নানারকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করেছিলেন বলেও প্রচারিত হয়। এই ঘটনায় প্রায় বারুদে অগ্নি সংযোগ করার মত অবস্থা হয়ে উঠলো। অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারের এক বিরাট সৈন্য বাহিনীকে রঙ্গীত নদীর তীরে মোতায়েন করা হল। সিকিম সরকারের পক্ষে এই হুমকিই যথেষ্ট ছিল। প্রায় এক মাস পরে (নভেম্বর—ডিসেম্বর, 1849 সাল) উভয় বন্দীকে মুক্ত করে দার্জিলিং-এ ফিরে যেতে দেওয়া হয়। কিন্তু সিকিমের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দার্জিলিং-এর জন্য পূর্বোক্ত ছয় হাজার টাকার বাৎসরিক অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হল এবং ডাঃ ক্যাম্পবেল-এর চেষ্টায় সিকিমের অন্তর্গত প্রায় 640 বর্গ মাইল আয়তনের বিশাল তরাই অঞ্চল ব্রিটিশ সরকার গ্রাস করে নিল।

ডাঃ ক্যাম্পবেল তার প্রতি অসম্মান করার প্রতিশোধ নেবার জন্য সমস্ত সিকিম অধিকার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সপক্ষে ছিলেন। কিন্তু তার এই প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ মহলে সমর্থিত হয়নি। এই তরাই অঞ্চলের সীমা ছিল উত্তরে রম্মন ও রঙ্গীত নদী, পূর্বে তিস্তা নদী, পশ্চিমে নেপাল, এবং দক্ষিণে পূর্ণিয়া জেলা। 1850 সালে এই বিস্তৃত তরাই অঞ্চল দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর আগে দার্জিলিং-এ যেতে হলে সিকিমের মধ্য দিয়ে যেতে হত এবং বৈদেশিক আইনের নীতি অনুসারে সিকিম সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেবার প্রয়োজন হতো। তরাই অধিকৃত হওয়ার পর সিকিম সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ব্রিটিশের সিকিম আক্রমণ ও চুক্তি

এই ঘটনার পর কিছুদিন উভয় পক্ষই নীরব ছিল। রাজা চুগ-ফুদ-এর যথেষ্ট বয়স হয়ে যাওয়াতে এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি প্রায় অবসর গ্রহণ করে চুম্বীতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছিলেন দেওয়ান নাম-গিয়াল। সুতরাং তার প্ররোচনায় আবার দার্জিলিং থেকে লোক অপহরণ করা শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার সিকিমের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করার জন্য যোগাযোগ করতে সচেষ্ট হলেও দেওয়ান নাম-গিয়ালের ব্রিটিশ-বিদ্বেষী মনোভাবের জন্য তা ব্যর্থ হয়। যে সমস্ত ব্রিটিশ নাগরিকদের দার্জিলিং থেকে অপহরণ করা হয়েছিল তাদের প্রত্যার্পণ করা ও তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বার বার চাপ দেওয়া সত্ত্বেও দেওয়ান নাম-গিয়াল তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। সুতরাং 1860 সালে দার্জিলিং থেকে ডাঃ ক্যাম্পবেল একদল সৈন্য নিয়ে রম্মন পাহাড় অতিক্রম করে সিকিমের মধ্যে রিন-চিন-পঙ পর্যন্ত এগিয়ে যান। দেওয়ান নাম-গিয়াল এই সম্ভাবনা কিছুটা অনুমান করেছিলেন এবং ভিতরে ভিতরে কিছুটা প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। তাই এবার সিকিমের রক্ষীবাহিনী ব্রিটিশ সেনার গতিরোধ করে পাল্টা আক্রমণ করে। ডাঃ ক্যাম্পবেল পশ্চাৎ অপসরণ করে দার্জিলিং ফিরে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল না বলেই বোধহয় দেওয়ান নাম-গিয়াল বার বার হঠকারিতা দেখিয়েছিলেন। নইলে অতি ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে অতি বৃহৎ ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করার স্বপ্ন তিনি দেখতেন না। 1861 সালে স্যার অ্যাশলে ইডেনকে দার্জিলিং-এর কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। এরপর কর্ণেল গাওলারের নেতৃত্বে প্রায় আড়াই হাজার ব্রিটিশ সৈন্যের এক বাহিনীকে

সিকিম আক্রমণ করার জন্য পাঠানো হয়। এই বাহিনী একেবারে বিনা বাধায় সোজা রাজধানী তুম-লং-এ প্রবেশ করল। কোন উপায় না দেখে দেওয়ান নাম-গিয়াল সিকিম ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন চুম্বীতে। বৃদ্ধ রাজা চুগ-ফুদ তখন যুবরাজ সিদ-কীয়ং-এর উপর সেই ব্রিটিশ বাহিনীকে মোকাবেলার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। অত্যন্ত শান্ত ও বিচক্ষণ যুবরাজ সিদ-কীয়ং সন্ধির প্রস্তাব করে অবস্থা আয়ত্বে আনলেন। 1861 সালের 28 মার্চ তেইশটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এক দীর্ঘ চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ইডেন এবং সিকিম রাজার প্রতিনিধি হিসেবে স্বাক্ষর করেন যুবরাজ সিদ-কীয়ং। এই চুক্তি অনুসারে ভারতের সঙ্গে সিকিমের অবাধ বানিজ্যের অধিকার দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সিকিমের আভ্যন্তরীণ বহু বিষয়ে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং সিকিমের রাজাকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করা হলেও সিকিমের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বন্ধক দিতে হয় ব্রিটিশ সরকারের ভাণ্ডারে। চুক্তিপত্রের সপ্তম অনুচ্ছেদটি পাগলা দেওয়ানের কৃতকর্মের চিরসাক্ষী হয়ে রইল, এতে তাকে সপরিবারে সিকিমের মাটি থেকে বিতারিত করার কথা ঘোষণা করা হয়। এমন কি ভবিষ্যতে তার কোন আত্মীয়কেও সিকিমের কোন সরকারী পদে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়। এই চুক্তির পর থেকে সিকিম এবং ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক সহজ হয়ে ওঠে।

ভূটানের দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নজর

সিকিম সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবার ভূটানের দিকে নজর দিতে শুরু করে। ভূটান সরকার সিকিমের পরিণতি দেখার পর ব্রিটিশদের সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। অ্যাশলে ইডেন পরের বছরই 1862 ভূটানের রাজার সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য ভূটানে যান। তরাই অঞ্চল অধিকার করার পর ভূটানের অন্তর্গত, আসাম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, পূর্ব দিকের ডুয়ার্স অঞ্চলের দিকেও ব্রিটিশদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ভূটানের দেবরাজা ডুয়ার্স অঞ্চল নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন চুক্তি করতে সম্মত হলেন না। এমন কি তিনি ইডেনকে বিশেষ সমাদর বা সম্মান দেখানোরও কোন চেষ্টা করেন নি। সুতরাং এবার ভূটানের দেবরাজাকে জব্দ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ইংরেজরা সচেষ্ট হল। এমন সময় খবর প্রচারিত হতে থাকে যে ভূটান সরকার দার্জিলিং আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভূটান আক্রমণ করার জন্য অজুহাত তৈরী করতে এ রটনা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দিক থেকেই প্রচারিত কিনা তা সন্দেহের

বিষয়। কিন্তু ভুটানের দেবরাজা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্বে না গিয়ে প্রথমেই সন্ধির প্রস্তাব করলেন। কালিংপঙ ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু জায়গা ব্রিটিশ সরকারকে ছেড়ে দিয়ে ভুটান তার আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করে 1865 সালে। কালিংপঙকে দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করা হয় 1866 সালে। এরপর উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের পার্বত্য দ্বার ব্রিটিশদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

অষ্টম চো-গিয়াল তথা মহারাজা সিদ-কীয়ং ঃ আপোষ ও শান্তি

অন্যদিকে 1861 সালের চুক্তির পরেই ব্রিটিশ সরকার সিকিমের অভ্যন্তরে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে ও বাণিজ্যিক উন্নতি সাধনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইংরেজদের ঈপ্সিত তিব্বত অভিযানের ভূমিকা সফল হয়েছে, সিকিমের রাজা তাদের অনুগত, ইংরেজ বিদ্বেষী দেওয়ান নাম-গিয়াল সিকিম থেকে চিরতরে বিতারিত। সুতরাং নিষ্কণ্টক সিকিমকে এখন অক্ষদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে ইংরেজ সরকার তার সাম্রাজ্যের জাল বিস্তার করে হিমালয়ের অন্যান্য পার্বত্য রাজ্যগুলিকে গ্রাস করার আয়োজনে উদ্যোগী হয়ে উঠল। 1863 সালে রাজা চুগ-ফুদ পরলোক গমন করলেন। তার জ্যেষ্ঠপুত্র লামাত্ব গ্রহণ করায় দ্বিতীয় পুত্র সিদ-কীয়ং 'মহারাজা' রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজা সিদ-কীয়ং প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার দার্জিলিং-এর জন্য যে বাৎসরিক অনুদান দেওয়া বন্ধ করেছিল তা আবার দিতে শুরু করে এবং 1862 সাল থেকে বকেয়া প্রাপ্য টাকাও পরিশোধ করে দেয়। 1866 সাল থেকে এই অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বার্ষিক নয় হাজার টাকা করা হয় এবং 1874 সালে তার পরিমাণ বার হাজার টাকায় বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও মহারাজা সিদ-কীয়ং এর সু ব্যবহারে প্রীত ব্রিটিশ সরকার তাঁকে পনেরটি তোপধ্বনির সম্মান দান করে।

দেওয়ান নাম-গিয়াল সিকিম থেকে বিতাড়িত হয়ে তিব্বতে লাসা সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। লাসা সরকার এই তিব্বতপন্থী দেওয়ানকে সিকিমে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র ছিল। তাই লাসা সরকার এ বিষয়ে মহারাজা সিদ-কীয়ংকে চাপ দিতে থাকে। নির্বিরোধী মহারাজা সিদ-কীয়ং দেওয়ান নাম-গিয়ালকে যে ফিরিয়ে নিতে অরাজী ছিলেন তা নয়, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার

কিছুতেই এই প্রাক্তন দেওয়ানের "অপরাধ" ক্ষমা করতে স্বীকৃত হয় নি। ফলে মহারাজা সিদ-কীয়ং তিব্বতের স্নেহ ও সহানুভূতি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হলেন। ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন অনুসারে মহারাজা সিদ-কীয়ং তাঁর সম্পর্কিত ভাই তথা পিতা চুগ-ফুদের অবৈধ সন্তান তেনজিং নাম-গিয়ালকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তেনজিং নাম-গিয়াল সাধারণত চাঙ-জোৎ কার-পো নামেই পরিচিত ছিলেন।

এখানে সিকিমের রাজপরিবারের ব্যক্তিগত ইতিহাস আলোচনা করার কিছুটা প্রয়োজন রয়েছে। তিব্বতী বা ভুটিয়াদের বিবাহ পদ্ধতি ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আগেই আলোচনা করে বলা হয়েছে যে এদের সমাজে যৌন জীবন নিয়ে কোন গোঁড়ামি বা কঠোর নীতি নেই। রাজপরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়েও তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে রাজা চুগ-ফুদের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস বোধহয় এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজা চুগ-ফুদ চারবার বিবাহ করেন। তাদের সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও এক রক্ষিতা রেখেছিলেন যার সন্তান দেওয়ান নাম-গিয়ালের স্ত্রী পেমা-লা এবং পুত্র তেনজিং বা চাঙ-জোৎ কার-পো। তবু শেষ বয়সে রাজা চুগ-ফুদ পঞ্চমবার তা-নাগ মন-কীৎ নামে একজন তরুণী সুন্দরীকে বিবাহ করেন। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না ও উচ্চভিলাষিণী এই মহিলা "মেনচি রাণী" নামেই প্রখ্যাতা ছিলেন। রাজা চুগ-ফুদের ঔরসে মেনচি রাণীর গর্ভে থুটব নাম-গিয়াল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে 1860 সালে। রাজার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে মেনচি রাণীর আরও দুইটি অবৈধ কন্যা জন্মায়। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ঘটনা হচ্ছে যে মহারাজা চুগ-ফুদের মৃত্যুর পরে মেনচি রাণী রাজার অবৈধ পুত্র তেনজিংকে বিবাহ করেন। অনেকে বলেন, রাজার মৃত্যুর আগেই তেনজিং নাম-গিয়ালের সঙ্গে মেনচি রাণীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং চুগ-ফুদ স্বয়ং তাদের বিবাহ অনুমোদন করে যান। সুতরাং সম্পর্কের দিক থেকে তেনজিং নাম-গিয়াল, থুটব নাম-গিয়ালের একাধারে ভাই এবং সৎ পিতা হলেন। তেনজিং নাম-গিয়ালের সঙ্গে বিবাহের পর মেনচি রাণীর আরও একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে 1866 সালে, তার নাম থিন-লে নাম-গিয়াল। রাজ পরিবারের এই জটিল সম্পর্ক সিকিমের ইতিহাসকেও জটিলতর করে তুলেছিল।

মহারাজা সিদ-কীয়ং যদিও সুদক্ষ শাসক ছিলেন, কিন্তু সিকিম সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করার আগেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন 1874 সালে। সিদ-কীয়ং-এর কোন সন্তান ছিল না। এ জন্য উচ্চ পর্যায়ের লামা ও সরকারী পদস্থ ব্যক্তিরা তাঁর সৎ ভাই, মেনচি রাণীর পুত্র, থুটব নাম-গিয়ালকে

সিংহাসনে অভিষিক্ত করার আয়োজন করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তেনজিং নাম-গিয়াল এবং মেনচি রাণী থুটবের পরিবর্তে তাঁদের উভয়ের পুত্র থিন-লে নাম-গিয়ালকে মহারাজা রূপে সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করে। এই সময় প্রাক্তন দেওয়ান (পাগলা দেওয়ান) চুম্বীতে বসবাস করছিলেন। তিনিও তেনজিং নাম-গিয়াল ও মেনচি রাণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে থিন-লে-কেই মহারাজা করার ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। কিন্তু এই ব্যাপারে দার্জিলিং-এর তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার স্যার জন এডগার-এর হস্তক্ষেপের ফলে মহারাজা চুগ-ফুদের বৈধ পুত্র থুটব নাম-গিয়ালকেই মহারাজা ঘোষণা করা হয় এবং তার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় যথানিয়মে। মেনচি রাণী এবং দেওয়ান নাম-গিয়ালের অভিসন্ধি আপাততঃ ব্যর্থ হলেও তারা একেবারে হাল ছাড়লেন না।

নবম মহারাজা থুটব ঃ নেপালী অনুপ্রবেশে সঙ্কট

মহারাজা থুটব মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে একদিকে পারিবারিক প্রতিকূলতা এবং আরেক দিকে রাজ্যের সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করলেন 1874—75 সালে। সিকিমে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নেপালী অনুপ্রবেশ শুরু হয়। এর প্রধান কারণ, সিকিমে সে সময়ে জনসংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প। এর আগেই বলা হয়েছে যে, লেপচা-ভুটিয়া অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল পশু পালন ও ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষিকাজে বা কায়িক শ্রমের কাজে তারা তেমন উৎসাহী ছিল না। অন্যদিকে গোর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়[1] গোর্খা তথা নেপালীদের শ্রম দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজদের পরিচয় ঘটেছিল—গোর্খারা একদিকে যেমন সুদক্ষ যোদ্ধা, তেমনি শান্তির সময়ে কৃষিকাজে ও শ্রমমূলক কাজে পারদর্শী। তাই বিভিন্ন শ্রমমূলক কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার নেপালীদের সিকিমে আসার জন্য উৎসাহিত করতে লাগল। এর পিছনে আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—সিকিমের এ যাবৎ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভুটিয়া-লেপচা সমাজের ঐক্যে হিন্দুধর্মী নেপালীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইংরেজদের দ্বিজাতি তত্ত্বের কৌশলটি প্রয়োগ করে বিভেদের বীজ বপণ করা। এ বিষয়ে কিছু কিছু সুবিধাবাদী কাজী বা সামন্ত প্রভুদের সমর্থন ও সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ করে, খাঙ-সা দেওয়ান এবং ফোদং লামা নামে দুজন প্রতিপত্তিশালী ভুটিয়া জমিদার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের

1. Anglo Gorkha War, 1814-15

বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। মহারাজা সিদ-কীয়ং-এর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিরোধে না যাওয়ার নীতির ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই নেপালী জনসংখ্যা এক বিরাট আকার ধারণ করে। তবুও মহারাজা সিদ-কীয়ং যে এ বিষয়ে একেবারেই সচেতন ছিলেন না তা নয়। 1873 সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর যখন দার্জিলিং পরিদর্শন করতে এসেছিলেন, তখন মহারাজা সিদ-কীয়ং তার সঙ্গে দেখা করে সিকিম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুতে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা মাঝ পথেই বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে নেপালী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ব সিকিমের পেমা-ইয়াংসি পর্যন্ত নেপালী এলাকায় পরিণত হয়। স্বাভাবিক কারণেই সিকিমের ভুটিয়া-লেপচা অধিবাসীরা এবং লামারা শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

মহারাজা থুটব সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর সামনে এই নেপালী জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ভুটিয়া-লেপচা অধিবাসীরা এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য মহারাজাকে চাপ দিতে থাকে। ইডেন তখন বাংলার লেফটে-ন্যান্ট গভর্ণর। তিনি এই সময় কালিংপঙে এলে মহারাজা থুটব তাঁর সঙ্গে দেখা করে সিকিমে নেপালী অনুপ্রবেশ বন্ধ করার অনুরোধ জানান। লেফটেন্যান্ট গভর্ণর তাঁর অনুরোধ আংশিক রক্ষা করে ঘোষণা করেন যে শুধুমাত্র খালি ও পতিত জমিতেই নূতন অনুপ্রবেশকারীরা বসতি স্থাপন করার অনুমতি লাভ করবে। কিন্তু নেপালী কৃষকদের দিয়ে জমিতে চাষ করিয়ে কিছু কিছু ভুটিয়া ভূ-স্বামীও যথেষ্ট লাভবান হচ্ছিলেন। ফলে খাঙ-সা দেওয়ান ও ফোদং লামার নেতৃত্বে তাদেরও একটি দল গড়ে ওঠে। এই সুবিধাবাদী দলটি সিকিম সরকার এবং গভর্ণরের ঘোষণা অমান্য করে দক্ষিণ পূর্বের রেহনক, চাকুং, রিসি প্রভৃতি অঞ্চলেও ক্রমাগত নেপালী কৃষক বসাতে থাকে। শুধু তাই নয়, এতদিন পর্যন্ত নেপালের দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকরাই সিকিমে কাজ পাওয়ার উদ্দেশ্যে চলে আসছিল ; এরপর নেপালের কিছু কিছু ধনী নেওয়ার ব্যবসায়ীও সিকিমে এসে জমি কিনে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ফোদং লামা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এক মিথ্যা নিদর্শন পত্র জোগাড় করে দার্জিলিং থেকে লছমীদাস প্রধান নামে একজন ধনী ব্যবসায়ী ও তার ভাইকে এনে নামচি ও রংপোতে বিরাট আয়তনের জমি ইজারা দেয় এবং ধাতু মুদ্রা তৈরী করার কাজে লাগায়। এ ব্যাপারে দার্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনারের যোগ সাজস ছিল ও অসৎ অর্থের লেন-দেন হয়েছিল বলে অনেকে সন্দেহ করেন। এই লছমীদাস প্রধান ভাইরাই সিকিমের 'প্রধান' গোষ্ঠীর অগ্রদূত বলা হয়। এদের সাহায্যে আরও নেওয়ার ব্যবসায়ী সিকিমে এসে জমি ইজারা বা দীর্ঘমেয়াদী ভাড়া

নিয়ে বাস করতে থাকে। নেপালীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও শক্তি সিকিম সরকার ও ভুটিয়া-লেপচা অধিবাসীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠল।

এই সময় পেমা-ইয়াংসির প্রধান লামা ছিলেন তার-সঙ রিমপোচে। লামা তার-সঙ রিমপোচের সঙ্গে নেপালী বিরোধী ভুটিয়ারা সমবেত হয়ে রেহনকের কাছে নেপালী কৃষকদের জোর করে উৎখাত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ঘটনা শেষে দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত হয়। নেপালীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পেমা-ইয়াংসি গোম্পায় প্রবেশ করে হামলা চালালে দুজন লামা ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং বেশ কয়েকজন লামা আহত হন। সিকিমের ভুটিয়া-লেপচা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমাজের কাছে এ এক চরম অমঙ্গলকর ঘটনা। সারা সিকিমে শোকের ছায়া ঘনিয়ে আসে। লামা তার-সঙ স্বয়ং দার্জিলিং গিয়ে ডেপুটি কমিশনারের কাছে নালিশ জানিয়ে ঘটনার তদন্ত করার দাবী জানান। ডেপুটি কমিশনার একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে সমস্যার সমাধান করার জন্য সিকিমে পাঠান, কিন্তু সেই ইংরেজ ফোদং লামা ও খাঙ-সা দেওয়ানের সপক্ষে রায় দিয়ে নেপালী বসতি সমর্থন করে চলে যান ১৮৮০ সালে।

মহারাজা থুটব সেই সময় চুম্বীতে তাঁর গ্রীষ্মাবাসে ছিলেন। রাজধানী তুম-লং প্রায় শূন্য অবস্থায় পড়ে ছিল। প্রধানমন্ত্রী তেনজিং নাম-গিয়াল তার আগের বছরই পরলোক গমন করেছিলেন। মহারাজা থুটবের জীবনে এই সময় আরেক দুর্ঘটনা ঘটে। তিব্বতী প্রথা অনুসারে মহারাজা থুটব তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই মহারাজা সিদ-কীয়ং-এর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। তাঁদের দুই পুত্র জন্ম লাভ করে, চো-দা নাম-গিয়াল এবং সিদ-কীয়ং টুলকু। দ্বিতীয় পুত্র সিদ-কীয়ং টুলকুকে মহারাজা সিদ-কীয়ং-এর অবতার বলে মনে করা হতো। (মহারাজা থুটবের পরে তিনিই সিকিমের সিংহাসনে আরোহণ করেন)। 1880 সালে পেমা-ইয়াংসি গোম্পার মাটি যখন লামাদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, চুম্বীতে তখন মহারাজা থুটবের ধর্মশীলা পত্নীও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর তারপরই চুম্বীতে রাজ পরিবারের আরেক রঙ্গভূমি তৈরী হয়।

দেওয়ান নাম-গিয়ালের ষড়যন্ত্র ও ইয়েশে দোলমার বিবাহ

তিব্বতপন্থী দেওয়ান নাম-গিয়াল সিকিমের আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারেন নি। তাই তিনি চুম্বীতেই বাস করছিলেন সুযোগের অপেক্ষায়। প্রধানমন্ত্রী তেনজিং নাম-গিয়ালের মৃত্যুর পর মেন্‌চি রানীও চুম্বীতেই বাস করতে শুরু করেন। সুতরাং এই দুই উচ্চাকাঙ্খী আবার সিকিমের ক্ষমতায় ফিরে আসার বাসনায় পরিকল্পনা করতে আরম্ভ করলেন। যদিও দেওয়ান নাম-গিয়ালের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল তবুও মেনচি

রানী তাঁর প্রাক বিবাহকালের অবৈধ কন্যা শেরিং-পুট্রির সঙ্গে দেওয়ান নাম-গিয়ালের বিবাহ দেন। দেওয়ান নামগিয়ালকে হাতে রাখার জন্য মেনচি রানী তাঁর তরুণী কন্যাকে এই বিবাহে প্রায় বাধ্য করেছিলেন। তাঁর পুত্র থিন-লেকে মহারাজা করার আকাঙ্ক্ষা সফল না হলেও দেওয়ান নাম-গিয়ালের সাহায্যে তিনি নতুন কোন সুযোগের সন্ধান করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেই সুযোগ এল। মহারাজা থুটবের পত্নীর মৃত্যুর পর উচ্চ লামারা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তাঁকে আবার বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। মহারাজা থুটব প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও পরে তিব্বতের কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে তাদের প্রস্তাবে রাজী হন। সুতরাং মহারাজার বিবাহের যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে সিকিম দরবার থেকে কয়েকজন প্রতিনিধিকে তিব্বতে দালাই লামার কাছে পাঠান হয়। এই খবর পাওয়া মাত্র দেওয়ান নাম-গিয়াল ও মেনচি রানী পুত্র থিন-লেকে সঙ্গে নিয়ে তিব্বতের পথে রওনা হয়ে যান। মহারাজার বিবাহের ঘটক দলটি লাসায় পৌঁছে দালাই লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর সহায়তায় তিব্বতের সম্ভ্রান্ত লহাডিং বংশের কন্যা ইয়েশে দোলমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে দেওয়ান নাম-গিয়াল ও মেনচি রানী তিব্বতে পৌঁছে ঐ কন্যার পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং মহারাজা থুটব ও থিন-লে, উভয়কে যুগ্ম স্বামী হিসেবে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিব্বতে বহুভর্তৃক বিবাহ প্রথা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাই ইয়েশে দোলমার পিতার পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব অসমর্থন করার কোন কারণ ছিল না। 1882 সালে থিন-লের উপস্থিতিতে এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মহারাজা থুটব স্বয়ং বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও, অন্যতম পাত্র হিসেবে নববধু ইয়েশে দোলমার স্বামীত্ব লাভ করলেন। মেনচি রানী আশা করেছিলেন যে এই যুগ্ম বিবাহের মাধ্যমে তাঁর পুত্র থিন-লে মহারাজা থুটবের সম-মর্যাদায় উন্নীত হতে পারবে। কিন্তু ঘটনার গতি অন্যদিকে বাঁক নেওয়াতে মেনচি রানীর সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

বিবাহের এক বছর পরে 1883 সালের মাঝামাঝি নববধু সহ থিন-লে চুম্বীতে ফিরে আসে। মহারাজা থুটব এই যুগ্ম বিবাহ স্বীকার করে নিতে হয়তো বা অরাজী হতেন না। কিন্তু মহারাজার কানে আগেই খবর পৌঁছে যায় যে নববধু ইতিমধ্যেই অন্তঃসত্তা। তাই চরম বিতৃষ্ণায় তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে মহারাজা তুম-লং-এ ফিরে আসেন। তরুণী ইয়েশে দোলমার পক্ষে সমস্ত পরিস্থিতি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। তিনি চুম্বীতে থিন-লের সঙ্গেই বাস করতে লাগলেন। তাদের

দুটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। মহারানী হওয়ার অধিকার নিয়েও ইয়েশে দোলমা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলেন।

তিব্বতে ব্রিটিশ বাণিজ্য-মিশন প্রেরণের প্রস্তুতি

একথা অনস্বীকার্য যে সিকিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর থেকে সব রাজাই তথা সিকিমের অধিবাসীরা তিব্বতকে অভিভাবক রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ধর্ম, সংস্কৃতি, রক্তধারা ও ভাষাগত ঐক্যই শুধু নয়, সিকিমের রাজপরিবার সহ অভিজাত ভুটিয়া পরিবারগুলির সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রেও তিব্বতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠেছিল। যেহেতু চীন ও তিব্বতের মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মৈত্রী ও সদ্ভাব ছিল, তাই চীনকেও সিকিমের রাজারা শুভার্থী রাষ্ট্র হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য চীন-নেপাল শান্তি চুক্তির সময়ে চীনের প্রতিনিধি হো-সী সিকিমের স্বার্থের প্রতি কিছুটা উদাসীনতা দেখানর ফলে সিকিম সরকার ক্ষুব্ধ হয়েছিল বটে, তবু আস্থাহীন হয়নি। অন্যদিকে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলেও এবং ব্রিটিশ সরকারের কবলে বাঁধা পড়লেও সিকিমের রাজা বা সরকার কখনই এই সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের বিদেশী সরকারকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে বা বিশ্বাস করতে পারেনি। মহারাজা থুটবের মনোভাবও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সিকিমের উপরে তিব্বত ও চীনের এই প্রভাব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিব্বত এলাকার মধ্যে চুম্বীতে সিকিম রাজপরিবারের গ্রীষ্মাবাস এবং সেখানে রাজা ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের প্রায়ই দীর্ঘসময় অবস্থান করা ব্রিটিশ সরকার সুনজরে দেখতে পারছিল না। এজন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে দার্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার সিকিমের রাজার কাছে এক নিষেধাজ্ঞা পাঠিয়ে জানান যে বছরে তিন মাসের বেশী তাঁরা চুম্বীতে অবস্থান করতে পারবেন না। অবশ্য চুম্বীতে থাকার ফলে সিকিমের শাসনকার্যও ব্যহত হচ্ছিল, সেটিও এই নিষেধাজ্ঞার অন্যতম কারণ। মহারাজা থুটব এতে ক্ষুন্ন হলেও নিষেধ অমান্য করার শক্তি তার ছিল না।

সিকিমকে ব্রিটিশ সরকার তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে কোলম্যান ম্যাকাওলে নামে একজন অভিযাত্রীকে উত্তর সিকিমে পাঠানো হয় (1884 সাল)। তার ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ম্যাকাওলে লিখেছেন—

"(1) To discuss with the Maharaja certain pending question concerning the administration of his State and his relations to the

British Government : (2) to visit the Lachen Valley to see if a trade rout could be opened up in that direction, with the province of Tsang in Tibet ; (3) to endeavour to meet, and to establish friendly relations with the Tibetan authorities of the district adjoining Sikkim on the north".

সিকিমে লাচুং উপত্যকা দিয়ে ম্যাকাওলে তিব্বত এলাকার খাম-বা-জোঙ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং খাম-বা-জোঙ-এর জোঙ-পণ অর্থাৎ জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে সম্ভাবনার আলো দেখতে পান। এরপর তিনি চীনের বেজিং পর্যন্ত গিয়ে চীন সরকারের সঙ্গেও সৌহার্দ্য স্থাপন করতে সক্ষম হন। লাসায় চীনের স্থায়ী রাজদূতের মাধ্যমে তিব্বতের সঙ্গে বানিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পাওয়া যাবে বলেও চীন সরকার আশ্বাস দেন। ব্রিটিশ সরকারের দীর্ঘ স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাব্য ভরসা নিয়ে তিনি দার্জিলিং-এ ফিরে যান। বলা বাহুল্য, তাঁর এই অভিযাত্রী দলের ভ্রমণের সব ব্যবস্থাই করতে হয়েছিল সিকিম সরকারকে।

1886 সালের প্রথম দিকে ম্যাকাওলের নেতৃত্বে লাসায় বাণিজ্য মিশন পাঠানোর আয়োজন শুরু হয়। সেইসময় তিব্বত এলাকার ফারী অঞ্চলে কিছু তিব্বতী ও ভুটানের ব্যবসায়ীর বিরোধকে কেন্দ্র করে অশান্তি শুরু হয়েছিল। এই দ্বন্দ্বের মধ্যস্থতা করার জন্য তিব্বতে অবস্থিত চৈনিক 'আমবান' বা রাজদূত ফারীতে নেমে আসেন এবং কর্মসূচী মত ভুটানেও যান। তাঁর এই ভ্রমণের সময় তিনি সিকিমের মহারাজা থুটবকে চুম্বীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য খবর পাঠান। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত মহারাজা থুটবের তিব্বত এলাকায় প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাই মহারাজা থুটব চুম্বীতে যাওয়ার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাইলেন। ব্রিটিশ সরকার এটি অন্যতম সুযোগ মনে করে মহারাজা থুটবকে চুম্বীতে গিয়ে চীনা রাজদূতের সঙ্গে ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করার নির্দেশ পাঠায়। কিন্তু মহারাজা থুটব চুম্বীতে পৌঁছনোর আগেই চীনা রাজদূত ভুটান থেকে ফিরে লাসায় চলে যাওয়াতে এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কিন্তু এবার ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থেই মহারাজা থুটবকে আরও কিছুদিন চুম্বীতে থাকার নির্দেশ পাঠায়। কেননা, এবার ম্যাকাওলের বাণিজ্য মিশন চুম্বী উপত্যকার মধ্যদিয়ে তিব্বতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। সুতরাং এ বিষয়ে মহারাজা থুটবের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। ভারত-তিব্বত বাণিজ্য যাত্রার রথ চালনায় মহারাজাকে শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহার করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

মহারাজা থুটব ও মহারানী ইয়েশে দোলমার মিলন

চুম্বীতে সেই কয়েক মাসের অবস্থান মহারাজা থুটবের জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রইল। রানী ইয়েশে দোলমা বিবাহের প্রথম আবেগময় মুহূর্তে থিন-লেকে স্বামী রূপে কাছে পেয়েছিলেন, তখন পারিবারিক জটিল পরিস্থিতি অনুধাবন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই যুগ্ম স্বামীর অন্যতম থিন-লের সঙ্গে ঘর করা তাঁর কাছে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়নি। তিনি জানতেন মহারাজা থুটবও তাঁর বৈধ স্বামী। ধীরে ধীরে যখন তিনি সমস্ত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন তখন তাঁকে মহারাজার পরিত্যাগ করার কারণ স্পষ্ট হয়ে গেল তাঁর কাছে। এবার মহারাজা থুটব যখন চুম্বীতে এলেন, ইয়েশে দোলমা তাঁর রূপ, গুণ ও সেবা দিয়ে তাঁকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করলেন। বিবাহের দীর্ঘ চার বছর পরে মহারাজা থুটবের সঙ্গে মহারানী ইয়েশে দোলমার মিলন হলো। সেই নিবিড় মিলন থেকে উভয়ে আর কখনই বিচ্যুত হননি। মহারানী ইয়েশে দোলমা যে মহারাজা থুটবের শুধু প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন তাই নয়, সংস্কৃত কাব্যে স্ত্রীর বর্ণনার আক্ষরিক অর্থেই তিনি গৃহিনী, সখী, সচিব, শিষ্যা, ললিত কলাবিদ নারীর ভূমিকা পালন করে প্রকৃত সহধর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন। সিকিমের ইতিহাসে এই মহিলার নাম চিরদিন অম্লান-উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

মহারানী ইয়েশে দোলমা ঈশ্বরদত্ত রূপ ও গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে অধ্যয়ন করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও অধিকার ছিল। তাছাড়া চিত্রাঙ্কন ও শিল্প-সম্মত তিব্বতী হস্তাক্ষর লিপি তিনি আয়ত্ব করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ইয়েশে দোলমাই সর্বপ্রথম তিব্বতী ভাষায় সিকিমের ইতিহাস রচনা করেন, যদিও তা মহারাজা থুটবের সঙ্গে যুগ্ম নামে প্রচারিত। পরে রায়বাহাদুর লোব-দেন-চোদেন নামে মহারাজার ব্যক্তিগত সচিব এবং কাজী দাওয়া-সামদুব তার ইংরেজী অনুবাদ করেন। মহারানী ইয়েশে দোলমা সম্বন্ধে জন ক্লড হোয়াইট লিখেছিলেন যে ইয়েশে দোলমা যদি তিব্বতে জন্মগ্রহণ না করে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবেশে জন্মাতেন তবে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবময় স্বাক্ষর রেখে যেতে পারতেন।[1]

---

1. "This lady, the daughter of a Tibetan official in Lhasa, is a striking personality.
"...She is extremely bright and intelligent and has been well educated, although she will not admit that she has knowledge of any language but Tibetan. She

তিব্বত অভিযানের পটভূমি ও সিকিমের অসহযোগিতা

ম্যাকাওলের 'ট্রেড মিশন'-এর আয়োজন সম্পূর্ণ হলেও শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করতে হয়। চীনা আমবান-এর মারফৎ এই খবর পাওয়া মাত্র লাসায় চোঙ-দু এর (তিব্বতী সংসদ) জরুরী অধিবেশন ডাকা হয়। তিব্বতী সংসদ তিব্বতের অভ্যন্তরে চীনের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং তিব্বতের মাটিতে ইংরেজদের প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার এরপর তিব্বতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধ না করে অন্য পন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করল। এই বাণিজ্য অভিযানের অনুমতি লাভ করার জন্য মহারাজা থুটবকে তিব্বতে দালাই লামার কাছে আবেদন পত্র লেখার নির্দেশ পাঠানো হল। কিন্তু মহারাজা থুটবের পত্রের উত্তরে তিব্বত সরকার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল যদি তিব্বতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তবে তা অন্য রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমানায় অনধিকার পদক্ষেপ বলে তারা মনে করবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। ব্রিটিশ সরকার সিকিমের মধ্যদিয়ে জেলেপ-লা গিরিপথ পর্যন্ত যে রাস্তা নির্মাণ শুরু করেছিল এবং চুম্বীতে যে বিশ্রাম নিবাস তৈরীর পরিকল্পনা করেছিল তার বিরুদ্ধেও তিব্বত কঠোর অভিযোগ করে। এজন্য সিকিমের মধ্যদিয়ে ইংরেজ অভিযাত্রীদের তিব্বত এলাকায় প্রবেশ করার অনুমতি যাতে না দেওয়া হয়, মহারাজা থুটবকে সে বিষয়ে তিব্বত সরকার হুঁশিয়ার করে দেয়। নির্বিরোধী এই শান্তিকামী মহারাজা থুটব একদিকে তিব্বত

---

talks well on many subjects, which one would hardly have credited her with a knowledge of, and can write well. On the occasion of Queen Victoria's diamond jubilee, she personally composed and engrossed in beautiful Tibetan characters the address presented by the Sikkim Raj.

"...Her disposition is a masterful one and her bearing always dignified. She has a great opinion of her own importance, and is the possessor of a sweet musical voice,...She is always interesting, whether to look at or to listen to, and had she been born within the sphere of European politics she would most certainly have made her mark, for there is no doubt she is a born intriguer and diplomat... Her common sense and clear-sightedness were on many occasions of the greatest assistance to me in my task of administering and developing Sikkim."

White John Claud—*Sikkim and Bhutan*, 1971 pp. 22-24.

সরকারের কোপের ও অন্য দিকে ব্রিটিশ সরকারের চাপের সাঁড়াশিতে পিষ্ট হতে লাগলেন।

ব্রিটিশ সরকার তথা ইংরেজদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য তিব্বত সরকার 1887 সালে সিকিম থেকে বার মাইল দূরে অবস্থিত লিঙ-তু নামক স্থানে একটি অনুসন্ধান শিবির স্থাপন করে সেখানে কিছু তিব্বতী সৈন্যকে মোতায়েন করে রাখে। গভর্নর জেনারেল দালাই লামার কাছে এই শিবির তুলে নেবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। কিন্তু তার উত্তর এল খোদ তিব্বতী 'কা-শাগ' (মন্ত্রী পরিষদ) থেকে—প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ ভূমি রক্ষা করার অধিকার আছে, তিব্বত তার নিজের এলাকাতে সৈন্য শিবির স্থাপন করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার এবার তিব্বত-সিকিম সীমানার প্রশ্নে লিঙ-তু'র আইনসঙ্গত অবস্থান সম্বন্ধে সিকিম সরকারের অভিমত চেয়ে পাঠাল। রেহনক থেকে অল্প দূরে লিঙ তু'র বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে সিকিম ও চুম্বীর পশুপালক অধিবাসীরা পশুচারণের অবাধ সুবিধে ভোগ করত। এই জায়গাগুলির বিষয়ে সত্যই নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা ধার্য ছিল না। তিব্বত সরকার প্রাচীন দলিল অনুসারে রেহনককেও তিব্বতের অংশ বলে ঘোষণা করে। মহারাজা থুটব দালাই লামার অসন্তোষের ভয়ে তিব্বতের এই দাবী সমর্থন করে বলেন যে লিঙ-তু তিব্বতেরই অংশ, তিব্বত সরকার মহানুভবতা দেখিয়ে সিকিমের পশুপালকদের সুবিধের জন্য তা 'দান হিসেবে সিকিমকে দিয়েছিল। শুধু এই নয়, মহারাজা থুটব আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্রিটিশ সরকারকে লিখলেন যে, তিব্বত ও চীনের বিরুদ্ধাচরণ করা সিকিমের পক্ষে সম্ভব নয়, সিকিম চিরদিন এই দুই বৃহৎ শক্তির সহায়তা লাভ করে এসেছে। এ বিষয়ে আরও উল্লেখ করেন যে, 1886 সালে তিব্বতের গেলিং-এ এক ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে যাতে সিকিমের জনসাধারণ, লামা, সরকারী কর্মচারী সকলের সমর্থন সাপেক্ষে তিনি তাতে স্বাক্ষর করে তিব্বত ও চীনের আনুগত্য স্বীকার করেছেন। তিব্বত ও চীনের স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন কোন কাজ সিকিম সরকার অনুমোদন করবে না।

এই চিঠি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত চমকে দিল ব্রিটিশ সরকারকে। আসলে উল্লিখিত এই চুক্তিকে লাসায় অবস্থিত চীনা দূতাবাসের প্রতিনিধির কাছে লেখা স্মারকলিপির নামান্তর বলাই সঙ্গত। এতে ইংরেজ বিদ্বেষী সিকিম রাজার তিব্বত ও চীনের প্রতি নির্ভরতার কথাই বলা হয়েছিল। গেজেটিয়ার অফ সিকিম থেকে সেই চুক্তি পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"You have ordered us by strategy or force to stop the passage of

the Rishi river between Sikhim and British territory ; but we are small and the Sarkar (British Government) is great. and we may not succeed, and may fall into the mouth of the tiger-lion. In such a crisis, if you, as our old friend, can make some arrangements, even then in good and evil we will not leave the shelter of the feet of China and Tibet,.........We all, king and subjects, priests and laymen, honestly promise to prevent persons from crossing the boundary."

মহারাজার চিঠি ও চুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া না হলেও হিমালয়ের পার্বত্য রাজ্যগুলির বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের নীতি নূতন করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিল। মহারাজা থুটবের আকস্মিক মত পরিবর্তন ব্রিটিশ সরকারের এত দিনকার পরিকল্পনায় যে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং নূতন কৌশল অবলম্বন করার আগে ব্রিটিশ সরকারের সামনে যে প্রশ্নগুলি দেখা দিল তা হল—. (1) সিকিমকে 'এশিয়ার বেলজিয়াম' করে রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা। (2) সিকিম রাজ্য এরপর সরাসরি দখল করা উচিত হবে কিনা। (3) এরফলে তিব্বত ও চীনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াই শুরু হওয়া সম্ভব, সেই লড়াই-এর ঝুঁকি নেওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা। (4) তিব্বত ও চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার সত্যই কতটা লাভবান হতে পারবে। (5) এ বিষয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত কিনা।

এই সমস্যা বা প্রশ্নগুলির উত্তর আলোচনা করলেই ব্রিটিশ সরকারের পরবর্তী নীতির চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ সিকিমের উপর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিলে এই দুর্বল অসহায় ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে হয় নেপাল গ্রাস করবে অথবা তা তিব্বতের অন্তর্গত একটি প্রদেশে রূপান্তরিত হবে। সিকিমের উন্নতির জন্য ব্রিটিশ সরকার বহু অর্থ ব্যয় করেছে. তাই সিকিমের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এক বিরাট লোকসান স্বীকার করে নেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, চীন ও তিব্বতের সঙ্গে বড় সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য ব্রিটিশ শক্তি যদি পিছু হঠে যায় তবে ভারত সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা যথেষ্ট লঘু হয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ, দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে এর মধ্যেই বহু ব্রিটিশ নাগরিক চা-শিল্প ও বনজ সম্পদ সংক্রান্ত ব্যবসায়ে বহু অর্থ বিনিয়োগ করেছে, পার্বত্য এলাকায় ব্রিটিশ প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ চলে গেলে এই ব্যবসায়ীদের স্বার্থও নানাভাবে ব্যহত হবে। চতুর্থতঃ, ইংরেজদের ভাষায় 'মধ্যযুগীয় বর্বর' তিব্বতীদের কাছে নতি স্বীকার করে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের আশা বিনষ্ট করার চেয়ে এদের দমন করে চীন-ভারত বাণিজ্যের পথ নিষ্কণ্টক করা

লাভজনক। পঞ্চমতঃ, নিশ্চল অপেক্ষার চেয়ে ধীর গতিতে অগ্রসর হলে কার্যোদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

লিঙ-তু আক্রমণ ও ইঙ্গো-চীন চুক্তি

সুতরাং গভর্ণর জেনারেল দালাই লামার কাছে আবার লিঙ-তু থেকে সৈন্য শিবির অপসারণ করে নেবার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলেন। কিন্তু দালাই লামার দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এরপর গভর্ণর জেনারেল এক 'চরম পত্র' পাঠিয়ে হুঁশিয়ারী দিলেন যে 15 মার্চ 1888-এর মধ্যে যদি ঐ সৈন্য শিবির না সরান হয় তবে ব্রিটিশ সরকার বল প্রয়োগ করে তা হঠিয়ে দিতে বাধ্য হবে। তিব্বত এবারও নিরুত্তর রইল। অবশেষে 20 মার্চ ব্রিটিশ সরকার প্রায় দু' হাজার সৈন্যের এক বাহিনী পাঠিয়ে লিঙ-তুর সৈন্য শিবির ভেঙ্গে দেয়। পরিস্থিতি এক জটিল আকার ধারণ করে। চীন সরকার লিঙ-তু থেকে সৈন্য অপসারণ করার জন্য তিব্বতের কাছে আগেই অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তিব্বত সরকার তা গ্রাহ্য করে নি। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিব্বতে অবস্থিত চীনা আমবান ছুটে এলেন চুম্বীতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে। কারণ চীনের আত্মরক্ষার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। ব্রিটিশ সরকারের মনেও এ রকমই অভিপ্রায় ছিল। চুম্বীতে উভয়পক্ষের শান্তি আলোচনা শুরু হল। এ. ডব্লু. পল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু উভয়পক্ষের স্বার্থ বজায় রেখে কোন সুস্থ সমাধানে পৌঁছান সম্ভব না হওয়াতে সময় দীর্ঘায়িত হতে থাকে। ফলে 1889 সালে ইংলণ্ডের বিদেশ সচিব এইচ. এম. ডুরাণ্ড-কে এই আলোচনায় যোগ দেবার জন্য পাঠানো হয়, উভয়পক্ষের গ্রহণ যোগ্য সমাধানের সূত্র উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ বাদ-প্রতিবাদের পর অবশেষে 1890 সালের 17 মার্চ দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[1] কিন্তু তবুও চুক্তিটি এরপরে সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন সাপেক্ষে কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ জন্য 1893 সালে 5 ডিসেম্বর ঐ চুক্তিরই সংযোজক অংশ হিসেবে বাণিজ্য, যোগাযোগ, পশুপালন ও চারণভূমির সীমা ও অধিকার প্রভৃতি নীতির তালিকা সম্বলিত দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

1890 সালের এই বিখ্যাত চুক্তিপত্রে সিকিমকে ব্রিটিশ সরকারের 'সংরক্ষিত রাজ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে 1861 সালের চুক্তির পর থেকেই সিকিম

---

1. Anglo-Chinese Convention, 1890

ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। চীন সরকার সিকিমের উপর থেকে সমস্ত অধিকার, প্রভাব ও কর্তৃত্ব ত্যাগ করার অঙ্গীকার করে। পর্বত চূড়া ও নদীধারার মাধ্যমে তিব্বত ও সিকিমের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট রূপে নির্ধারণ করা হয়। সিকিমে একজন স্থায়ী রাজনৈতিক সচিবের পদ সৃষ্টি করে তার হাতে আভ্যন্তরীণ শাসন ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। আর সিকিমের মহারাজার উপাধিটি ছাড়া সব ক্ষমতাই কেড়ে নিয়ে তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের হাতের ক্রীড়নক মাত্র করে রাখা হয়।

ক্লড হোয়াইট 1890 সালের জুন মাসে সিকিমের প্রথম রাজনৈতিক সচিব হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি 1887 সাল থেকেই সিকিমে বাস্তুকার হিসেবে রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য কারিগরী কাজের দায়িত্বে ছিলেন। লিঙ-তু অভিযানের বাহিনীতেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এই পার্বত্য রাজ্যটির প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শক্তি ও সম্পদ, স্থানীয় অধিবাসীদের চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি এর মধ্যেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। এবার পরোক্ষ শাসক হিসেবে সিকিমের শাসন ব্যবস্থার সুসংহত রূপ দেবার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। প্রথমেই তিনি সিকিমের কিছু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে মনোনীত করে, তাকে শাসন কাজে সহায়তা করার জন্য একটি পরিষদ গঠন করেন। বলা বাহুল্য, এ পরিষদে মহারাজার সমর্থকদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। হোয়াইট সিকিমের গ্যাংটকে রাজপ্রতিনিধি নিবাস (রেসিডেন্সী) স্থাপন করে সেখান থেকেই শাসন-কার্য চালাতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে এই গ্যাংটক, যার তিব্বতী নাম ছিল “গান্তোক” অর্থাৎ পর্বত শিখর, তা একটি আধুনিক শহর হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে গ্যাংটকই সিকিমের রাজধানী রূপে পরিচিত হয়। এরপর ইংরেজ শাসকের সহায়তায় সিকিমে বিপুল আকারে নেপালী অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাদের সংখ্যা স্থানীয় লেপচা-ভূটিয়াদের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে যায়। হোয়াইট সিকিমের শাসনভার হাতে নেবার আগে এখানকার শাসন ব্যবস্থার যে চিত্র এঁকেছেন তা তার ভাষাতেই উল্লেখ করা যাক—

“There was no revenue system....no court of justice, no police, no public work, no education for the younger generation. The task before me was a difficult one, but very fascinating ; the country was a new one and everything was in my hands.”

পর রাজ্য-গ্রাসী একজন ইংরেজের এই মন্তব্যে প্রভাবিত না হয়ে যদি এর বিপরীত

চিত্রটি অনুধাবন করার চেষ্টা করা যায় তবে বলা যায়, সিকিমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলো-আঁধারি তখনও প্রবেশ করেনি সত্য, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা সাধারণ জনগণের মধ্যে এক গভীর নিরাসক্ত শান্তিপ্রিয়তা প্রবাহিত করেছিল। তাই বিচারশালার প্রহসন ও পুলিসী দমন সিকিমের সমাজ জীবনকে কখনও বেদনাক্রান্ত করেনি। সিকিমে রাজ্য স্থাপনের আদি যুগ থেকে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বহিঃআক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেও, সিকিম কখনও পররাজ্য আক্রমণ করার জন্য প্রবৃত্ত হয়নি। এক অতি ক্ষুদ্র রক্ষীবাহিনী নিয়ে সিকিম সর্বদাই আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে মাত্র। সিকিমের সমাজ জীবনে আদিমতা হয়তো ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নকল মুখোশ, নকল আচ্ছাদন তার হৃদয়ের সত্যকে আড়াল করেনি।

মহারাজা থুটব ও মহারানী ইয়েশে দোলমার গৃহ-বন্দী অবস্থা

হোয়াইট অনুমান করেছিলেন যে 1890 সালের চুক্তির পর মহারাজা থুটব হয়তো তিব্বতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। তাই তিনি মহারাজাকে চুম্বী থেকে চলে আসার জন্য আদেশ পাঠালেন। মহারাজা থুটব যখন সিকিমে ফিরে এলেন তখন নিজের গুরুত্বহীন, ক্ষমতাহীন অবস্থা সহজেই উপলব্ধি করতে পারলেন। সিকিমের সর্বময় কর্তা তখন ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার ক্লড হোয়াইট। মহারানী ইয়েশে দোলমা সহ মহারাজা থুটব গ্যাংটক থেকে কিছু দূরে না-বে নামক স্থানে প্রায় নজরবন্দী অবস্থায় বাস করতে থাকেন। তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্য মাত্র পাঁচশ টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করা হয়।

এরপর মহারাজা থুটব হয়তো নতিস্বীকার করে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত হয়ে উঠবেন, এটাই হোয়াইটের ধারণা ছিল। কিন্তু মহারাজা কোনভাবেই তার সঙ্গে আপোষ করেন নি, বরং উভয়ের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক তিক্ততর হতে থাকে। কিছুদিন পর মহারাজা থুটব রাব-দেন-সের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর সেখানে বাস করার উদ্দেশ্য প্রথমে কেউ অনুমান করতে পারেন নি। কিন্তু রাব-দেন-সে থেকে একদিন মহারাজা ও মহারানী কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁরা নেপালের মধ্যে দিয়ে তিব্বতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পদযাত্রায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যখন শ্রান্ত ক্লান্ত মহারাজা ও মহারানী তিব্বত সীমান্তের কাছে ওয়া-লং-এ এসে পৌঁছলেন তখন নেপালের রাজার চর তাদের ধরে ফেলে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মহারাজাকে বন্দী করে

দার্জিলিং-এ পাঠানো হয়, আর মহারানী গ্যাংটকে নজরবন্দী হয়ে থাকেন। প্রায় দু'বছর মহারাজাকে দার্জিলিং শহর থেকে নীচে গিং নামে এক নির্জন বস্তীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বন্দী করে রাখা হয়। অবশ্য পরে মহারানী ইয়েশে দোলমার একান্ত আবেদনে তাকেও মহারাজার সঙ্গে বাস করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং উভয়কেই কার্সিয়াং-এ স্থানান্তরিত করা হয়। কার্সিয়াং-এ বন্দী অবস্থায় থাকার সময় 1893 সালে তাদের পুত্র তাসী নাম-গিয়ালের জন্ম হয়, যিনি পরে সিকিমের রাজপদ লাভ করেন।

কার্সিয়াং-এ থাকার সময় দার্জিলিং-এর নূতন ডেপুটি কমিশনার মিঃ নোলান তাঁদের পরিদর্শন করতে এলে মহারাজা থুটব তাঁর প্রতি অবিচারের কথা একান্তভাবে তাকে বলার সুযোগ পান। নোলান তাকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার উপদেশ দেন এবং এ বিষয়ে সবরকম সাহায্য করার আশ্বাসও দেন। অবশেষে মহারাজা থুটব ক্ষমা প্রার্থনা করে গভর্ণর জেনারেলকে লিখলেন, এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতিও তাতে উল্লেখ করলেন। এর ফলে মহারাজা ও মহারানীকে দার্জিলিং-এ পাঠিয়ে, কিছুটা চলাফেরার স্বাধীনতা দিয়ে তত্ত্বাবধানে রাখা হল।

মহারাজা থুটব ও মহারানী ইয়েশে দোলমা এইসময় প্রায় এক বছর দার্জিলিং-এ বাস করেছিলেন আর তখনই আধুনিক জগৎ ও ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের চাক্ষুস পরিচয় হয়েছিল। মহারাজা থুটবের প্রথমা স্ত্রীর দ্বিতীয় পুত্র সিদ-কীয়ং টুলকু এইসময় দার্জিলিং-এর ইংরেজী স্কুলে পড়াশোনা শুরু করে। 1895 সালের শেষে মহারাজা থুটব ও মহারানী ইয়েশে দোলমা দীর্ঘ দুঃখ কষ্টের শেষে নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নূতন করে পা দিলেন সিকিমের মাটিতে। নূতন রাজধানীও তখন গ্যাংটক—সেখানেই নূতন প্রাসাদ তৈরী হল মহারাজার জন্য। মহারাজা থুটব এবং হোয়াইট এবার পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলেন। আর মহারানী ইয়েশে দোলমা, যাঁকে মহারাজার পরামর্শদাত্রী ও তিব্বতপন্থী বলে ব্রিটিশ সরকার সন্দেহ করতো, তিনি তাঁর প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও আভিজাত্য দিয়ে মুগ্ধ করলেন উন্নাসিক ইংরেজ রাজনীতিবিদ হোয়াইটের মত ব্যক্তিকেও। সিকিমের ইতিহাসেও উনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকার কেটে বিংশ শতাব্দীর প্রগতির আলো দেখা দিল।

ব্রিটিশ সরকারের তিব্বত জয়

ইংরেজদের সম্বন্ধে তিব্বতের মনোভাবের কিন্তু বিশেষ কোনই পরিবর্তন হয়নি,

বরং সন্দেহ ও আতঙ্ক তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। এজন্য 1890 সালের ইঙ্গো-চীন চুক্তি অগ্রাহ্য করে তিব্বত সরকার উত্তর সিকিমের জিয়াগঙ-এর কাছে আবার একটি সৈন্য শিবির স্থাপন করে। ব্রিটিশ সরকার এবিষয়ে তিব্বতে চীনা আমবান-এর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তিব্বতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আপোষ আলোচনার প্রস্তাব করে পাঠায়। কিন্তু কয়েক বছর ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো সত্ত্বেও যখন তিব্বত সরকারের পক্ষ থেকে কোন আগ্রহ বা সহযোগিতার সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন ব্রিটিশ সরকার এক বাহিনী পাঠিয়ে জিয়াগঙের শিবির উৎখাত করল (1902 সাল)। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়া অন্যতম শক্তি রূপে আবির্ভূত হয় এবং তিব্বতের প্রতি রাশিয়ার ঔৎসুক্যও ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তিব্বত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করার আর কোন যুক্তি ছিল না। তিব্বতের লামা শাসকগণ যে সহজে আত্ম বিক্রয় করবে না তা ইংরেজ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তাই 1903 সালে কর্ণেল ইয়ং হাসব্যাণ্ড-এর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী তিব্বত অভিযানে রওনা হয়। বিপুল সংখ্যক লেপচা-ভুটিয়া ও নেপালী কুলির দল "আপন ক্রশ আপন স্কন্ধে" বহন করার মত সেই বিরাট বাহিনীর সমস্ত রসদ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে গিয়েছিল দুর্গম হিমময় পার্বত্য চড়াই পথ বেয়ে। তবে একেবারে বিনা বাধায় ব্রিটিশ সৈন্য সেই তুষারাচ্ছন্ন ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়নি,—ইয়াতুং ও গ্যাংসের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের মুখোমুখি হতে হল মুণ্ডিত মস্তক, রক্তাম্বরধারী লামা সেনাবাহিনীকে। এই বাহিনী বুদ্ধের অহিংসার বাণী দলিত করে লাসার নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে অবশেষে জয় করতে সমর্থ হল সেই ধর্মরাষ্ট্রকে। 1904 সালের 7 সেপ্টেম্বর তিব্বতের 'পোতালা' প্রাসাদে ধর্মগুরু ও সন্ন্যাসী শাসক দালাইলামা ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন[1] এবং 1893 সালের প্রোটোকল অনুসারে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে স্বীকৃত হলেন। ব্রিটিশ সরকারের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হল। কিন্তু প্রাচ্যের ধর্মচেতনায় পদাঘাত করে ব্রিটিশ শক্তি যখন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হল, প্রতীচ্যের আকাশে তখন সেই সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু ঘণ্টা ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। □

1. Lhasa Convention, 1904

তিন

গণ আন্দোলন ও নব যুগের পটভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে 1945 সাল পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়কে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নব যুগের নব জন্মের প্রস্তুতি পর্ব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সিকিমও সেই নব জন্মের প্রতীক্ষায় পুষ্ট হয়ে উঠছিল। ঘটনাস্রোত দ্রুত প্রবাহিত হতে শুরু করে নূতন জন্মের আর্তি নিয়ে।

এ কথা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে 1890 সালে ব্রিটিশ সংরক্ষিত রাজ্য রূপে ঘোষিত হওয়ার পর সিকিম ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজন্য শাসিত রাজ্যের সম মর্যাদা লাভ করেছিল এবং অলিখিতভাবে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তথাকথিত 'Native State' হিসেবেই ইংরেজ সরকারের কাছে তার পরিচিতি ছিল। মহারাজা থুটব নাম-গিয়াল প্রথম দিকে ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ না করলে তিনিও হয়তো ব্রিটিশ সরকারের অনুকম্পা ও করুণা পুষ্ট হয়ে নানা ভাবে লাভবান হতে ও মর্যাদা ভোগ করে ধন্য হতে পারতেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকেও নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার জন ক্লড হোয়াইট সিকিমের শাসন ক্ষমতার অধীশ্বর নিযুক্ত হওয়ার পরে মহারাজা থুটবের অসহযোগ ও ঔদ্ধত্য দমন করার জন্য যত উদ্যোগী হয়েছিলেন, রাজ্যের উন্নতি বিধানে তত মনোযোগ দেবার অবকাশ পান নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাই সিকিমের সামাজিক জীবনে বা রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নি। শুধু মহারাজা থুটবের পুত্র সিদ-কীয়ং টুলকু ও অন্যান্য কিছু উচ্চবিত্ত কাজীর পুত্ররা দার্জিলিং-এ ইংরেজী শিক্ষার আলোক পেতে আরম্ভ করেছিল, এইটুকুই যা ব্যতিক্রম বলা যায়। এ পর্যন্ত সিকিমে কোন আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয় নি। সিকিমে প্রথম আধুনিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় 1906 সালে এবং তার প্রথম ছাত্র হন মহারাজা থুটব ও মহারানী ইয়েশে দোলমার পুত্র তাসী নাম-

গিয়াল (বর্তমানে সেই স্কুল তাসী নামগিয়াল একাডেমী নামে পরিচিত)। সিকিমে প্রথম আধুনিকতার বীজ এ দ্বারাই বপণ হয়েছিল বলা যায়।

দশম মহারাজা সিদ-কীয়ং টুলকু ঃ আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয়

1908 সালে হোয়াইটকে ভুটানে পাঠানো হয় এবং পলিটিক্যাল অফিসারের পদের পরিবর্তে সুপারিনটেণ্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়ে স্যার চার্লস বেল সিকিমের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেন। নরমপন্থী চার্লস বেল সিকিমের সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিব্বতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাই হোয়াইটের দমন নীতির পরিবর্তে বেল সিকিমের শাসন ব্যবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হন। সিকিমের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অবিরাম নেপালী অনুপ্রবেশের পরিণাম তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং লোপচা-ভুটিয়া সমাজের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তা রোধ করার জন্যও সক্রিয় হয়েছিলেন। এজন্য রাজ-পরিবার ও লেপচা-ভুটিয়া সমাজের সহযোগিতা লাভ করতে তার অসুবিধে হয় নি। দীর্ঘদিন পরে আবার সিকিমে শান্তির পরিবেশ গড়ে ওঠে। মহারানী ইয়েশে দোলমা 1910 সালে পরলোক গমন করেন এবং চার বছর পরে 1914 সালে মহারাজা থুটবও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সিকিমের ইতিহাসেও নূতন অধ্যায় শুরু হয়।

মহারাজা থুটবের মৃত্যুর পর প্রথা অনুসারে তাঁর প্রথম পক্ষের জেষ্ঠ্য পুত্র চো-দা নাম-গিয়ালকে সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তিব্বত পন্থী এই রাজকুমার বরাবর চুম্বীতেই অবস্থান করছিলেন এবং তার প্রতি ব্রিটিশ সরকারও খুব প্রসন্ন ছিল না। তিনি চুম্বী ত্যাগ করে সিকিমে আসতে অস্বীকার করেন এবং রাজপদ গ্রহণের প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেন। ফলে মহারাজার দ্বিতীয় পুত্র সিদ-কীয়ং টুলকুকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। সিদ-কীয়ং টুলকু মহারাজা থুটবের জীবিত অবস্থাতেই রাজকার্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। দিল্লীর দরবারে তিনিই মহারাজার প্রতিনিধিত্ব করতেন—ইংলণ্ডে পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানেও তিনিই সিকিমের মহারাজার প্রতিভূ হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তাই সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ-কীয়ং অভিজ্ঞ শাসকের মত স্বমত অনুসারে কাজ করতে শুরু করলেন এবং সিকিমের সমাজ জীবনের পরিবর্তন ও উন্নয়ণে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত, আধুনিক রুচি সম্মত ও প্রগতিবাদী এই প্রাণবন্ত যুবক মহারাজা

একদিকে যেমন সিকিমের প্রাচীনপন্থী সরকারী কর্মচারীদের ও লামাদের বিরাগ-ভাজন হয়ে উঠলেন, অন্যদিকে তেমনি ব্রিটিশ প্রতিনিধি চার্ল্স বেল-এর কাজের প্রতিবন্ধক হয়ে অসন্তোষ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করার ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ব করেছিলেন তা সিকিমের অনগ্রসর রক্ষণশীল চিন্তা ধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সিদ-কীয়ং সিকিমের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার হয়ে উঠলেন, তেমনি গোম্পা ও লামাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করতে লাগলেদ। সুতরাং তাঁর এই বৈপ্লবিক মতবাদ সিকিমের প্রাচীন বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের ভিত কম্পিত করে তুললো। অন্যদিকে বেল-ও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলেন যে এই স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবাদী, দৃঢ় ব্যক্তিত্বের যুবকটিকে শুধু পুতুল মহারাজা করে সিংহাসনের দোলনায় বসিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। উভয়ের মধ্যে শীতল দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। এই অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করলো যখন সিদ-কীয়ং একজন ব্রহ্মদেশীয় তরুণীকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ করার সময় এই তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয় এবং তিব্বতী মহিলাকে বিবাহ করার প্রাচীন রীতিকে ভেঙ্গে তিনি তাকেই বিবাহ করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। সিকিমের প্রাচীন ঐতিহ্যে তাঁর এই সিদ্ধান্ত যেমন ধাক্কা দিল, অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও এর পিছনে অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। ফলে মহারাজা সিদ-কীয়ং টুলকু তাঁর প্রগতি-বাদী তীক্ষ্ণতা নিয়ে কাঁটার মত যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা হয়ে বিদ্ধ করতে লাগলেন চার্ল্স বেল তথা ইংরেজ সরকারকে।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সিংহাসনে আরোহণ করার আট মাসের মধ্যে মাত্র এক রাত্রের অসুস্থতায় মারা গেলেন মহারাজা সিদ-কীয়ং (এপ্রিল 1914—ডিসেম্বর 1914)। এই সন্দেহজনক মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত শোনা যায়। অনেকের ধারণা যে এর পিছনে চার্ল্স বেল-এর গোপন ভূমিকা ছিল। মহারাজার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে বেল একজন ইংরেজ চিকিৎসককে তাঁর চিকিৎসার জন্য পাঠান। কিন্তু এই চিকিৎসকের অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতি রাজ পরিবারের অনেকেরই সন্দেহের উদ্রেক করে। অন্যদিকে প্রগতিবাদী মহারাজার প্রতি ক্ষুব্ধ লামারা এই মৃত্যুর এক অলৌকিক ব্যাখ্যা প্রচার করলেন। গোম্পা ও লামাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে এক অপদেবতাকে দিয়ে নাকি রাজার প্রাণ হরণ করেন। শোনা যায়, সিদ-কীয়ং তাঁর

সেদিনের সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে ফেরার সময় কোন এক বিচিত্র অশরীরী ব্যাঘ্র মূর্তি দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গের পোষা বিলিতি কুকুর দুটিও নাকি কোন অদৃশ্য আভাসে বিচলিত হয়ে চিৎকার করতে শুরু করেছিল। গৃহে ফেরার পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শবদেহের দুই কাঁধে নাকি দুটি বাঘের নখের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য কোন পক্ষই কোন আগ্রহ প্রকাশ করে নি। সিকিমের প্রগতিও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

একাদশতম মহারাজা তাসী ঃ গৌরবময় যুগ বলে খ্যাত

এরপর মহারাজা সিদ-কীয়ং-এর বৈমাত্রেয় ভাই তাসী নাম-গিয়াল মাত্র বাইশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করলেন (1915 সালে)। তরুণ তাসী নাম-গিয়াল ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও শান্ত প্রকৃতির, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বেল-এর অভিভাবকত্ব মেনে নিলেন। বেল এবার নিষ্কণ্টক শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিব্বতী ছাঁচে গড়া সিকিমের শাসন ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করার দায়িত্ব পালন করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। তার পূর্বসূরী হোয়াইট সিকিমের রাজস্ব প্রথার কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন শুরু করেছিলেন, তিনি সেই আরব্ধ কাজ আরও সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করলেন। ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমগ্র সিকিম রাজ্যটি কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করে তার মালিকানা দেওয়া হয় একেকজন সামন্ত প্রভু বা 'কাজী' নামের জমিদারকে। জমির পরিমাণ ও উৎপাদন অনুসারে বাৎসরিক নির্দিষ্ট কর ধার্য করা হয়। এই সামন্ত প্রভুরা আবার তাদের অধীনে ঠিকাদার বা আধিয়ারদের জমির পত্তনি বা ইজারা দিতে থাকেন। রাজ পরিবারের ব্যক্তিগত অধিকারে ছিল ষোলটি এস্টেট বা এলাকা। এ ছাড়া সিকিমের প্রধান গোম্পাগুলির জন্য নিজস্ব এস্টেট বা ভূমি সম্পত্তি আলাদা ভাবে নির্ধারণ করা হয়।

1916 সালে সিকিমে প্রথম আধুনিক আদালত স্থাপিত হয় এবং একজন যোগ্যতা-সম্পন্ন বিচারক নিয়োগ করে আইনসঙ্গত বিচার ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। এর আগে পর্যন্ত গ্রামের প্রধান বা কাজীদের হাতেই ছিল সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার বিচার ক্ষমতা। হত্যা বা গর্হিত অপরাধের সংখ্যা সিকিমে নিতান্তই বিরল ছিল, তবু এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটলে তার বিচার রাজদরবারে স্বয়ং মহারাজার উপস্থিতিতে সম্পন্ন হতো। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুবিচার পাওয়ার কোন পথ যে সাধারণ মানুষের সামনে ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায়। নূতন বিচার ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের মনে তাই এক বিরাট আস্থা এনে

দিল। এই আদালতে একবার একজন প্রজাকে রাজদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, বিচারকদের অন্যতম ছিলেন চার্ল'স বেল,—প্রাণদণ্ডের আদেশ পত্রেও স্বাক্ষর করেন তিনি। অপরাধের কারণ নির্ণয় এবং বিচারের অসঙ্গতিতে সিকিমের সমস্ত অধিবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত ও প্রভাবান্বিত ধর্মপরায়ণ সাধারণ মানুষের মনে এই দণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরপর মহারাজা তাসী এক অলিখিত আদেশে প্রাণ-দণ্ড দান রহিত করেন। সিকিমের আদালতে এইটিই প্রথম ও শেষ প্রাণদণ্ড দানের নজীর।

1917 সালে পৃথিবীর আকাশ বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিও ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে চলেছে। সুতরাং এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে প্রভুত্ব বিস্তার করার চেয়ে ইউরোপের উত্তাল তুফানে রণপোত চালনা করে গ্রেট ব্রিটেন তার 'মহানুভবতা' রক্ষা করতেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ফলে কখন অজান্তে সিকিমের বুক থেকেও ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের চাপ শিথিল হতে শুরু করেছিল। 1918 সালে সিকিমের আভ্যন্তরীণ শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা মহারাজার হস্তে প্রত্যার্পণ করা হল, শুধু বৈদেশিক সম্পর্ক ও সীমান্ত রক্ষার বিষয়ে ব্রিটিশের কর্তৃত্ব আগের মতই বজায় রইল। দীর্ঘদিন পরে সিকিম তার হৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আংশিক ভাবে ফিরে পেল। মহারাজা তাসী নাম-গিয়াল সুদক্ষ কাণ্ডারীর মতই শাসন ব্যবস্থার হাল ধরলেন। বেল অবসর গ্রহণ করে ফিরে যান 1920 সালে এবং সেই সঙ্গেই সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পদের অবসান করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য একজন পলিটিক্যাল অফিসারের পদ রাখা হয়। সিকিমের আভ্যন্তরীণ শাসনে তার কোন ভূমিকা ছিল না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ব্রিটিশ শাসন ধারার প্রভাবে সিকিমের শাসন ব্যবস্থাও এর মধ্যে নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। চাঙ-জোং, থুঙ-ইক, দোনীয়ার প্রভৃতি পুরোন সরকারী পদের পরিবর্তে বেতন ভোগী সচিবদের হাতে বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। প্রত্যেক সচিব তার কাজের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীল ছিলেন মহারাজার কাছে। প্রধান সচিব ছিলেন একাধারে মহারাজার ব্যক্তিগত সচিব এবং অনিবার্যভাবেই তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। মহারাজা তাসী শাসন কাজে পরামর্শ দেওয়া ও সহায়তা করার জন্য একটি পরিষদ গঠন করেন, মহারাজার ব্যক্তিগত মনোনীত সমাজের অভিজাত উচ্চবিত্ত কাজী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরাই যে এর সদস্যপদ লাভ করলেন সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই পরিষদে

একজন লামা সদস্যকে গ্রহণ করা হয় এবং পেমা-ইয়াংসি গোম্পায় প্রধান লামাদের মধ্য থেকেই তাকে মনোনীত করা হয়। পরিষদের কোন নির্দিষ্ট স্থায়িত্বকাল ছিল না, এর গঠন ও পুনর্গঠন নির্ভর করতো সম্পূর্ণ রূপে মহারাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর।

সিকিমের তিনশত বছরের নাম-গিয়াল রাজবংশের উজ্জ্বলতম শাসক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন মহারাজা তাসী। দার্জিলিং-এর সেন্ট পলস স্কুলে এবং সেকালে রাজন্যবর্গের সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট আজমীরের মেয়ো কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন তিনি। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। শিক্ষাতিরিক্ত আরও একটি সহজাত গুণ ছিল তাঁর,—তিনি ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের চিত্রশিল্পী। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শৈল্পিক চেতনা মহারাজা তাসীকে এক পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব দান করেছিল। এই চারিত্রিক বৈশিষ্টের জন্য তিনি যেমন স্বদেশে সমস্ত জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন, তেমনি ব্রিটিশ সরকারের কাছেও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও রাজ্যের মান বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কে. সি. এস. আই এবং কে. সি. আই. ই খেতাবে ভূষিত করে সন্মানিত করে। মহারাজা তাসী ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য হিসেবে দিল্লীর দরবারেও স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সিকিমকে যে তখন ভারতবর্ষের অন্তর্গত রাজন্য-শাসিত রাজ্য হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছিল তার অন্যতম উদাহরণ—1935 সালের সরকারী আইনে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় আইন সভায় রাজ্য পরিষদে সিকিমের জন্যও একটি আসন বরাদ্দ করা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিকিমের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। চল্লিশের দশক পর্যন্ত সিকিমে মহারাজা তাসীর শান্তিপূর্ণ গৌরবময় শাসনকাল অতিবাহিত হয়।

মহারাজা তাসীর ব্যক্তিগত দুঃখময় জীবন

কিন্তু চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই মহারাজা তাসীর ব্যক্তিগত জীবনের এবং রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশের শান্তি প্রায় একই সঙ্গে বিঘ্নিত হতে আরম্ভ করে। 1918 সালে মহারাজা তাসী তিব্বতের এক সামরিক অধিনায়কের কন্যা কুলুঙ-দে-চেনকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মহারাজা তাসীর সঙ্গে মহারানী কুলুঙ-দে-চেনের মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে এবং মহারানী গ্যাংটক থেকে কিছু দূরে পেন-লঙের 'তাক্‌চি' প্রাসাদে আলাদা ভাবে বাস করতে থাকেন। এর চেয়েও আরও এক চরম আঘাতে মহারাজা তাসীর

হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ পাল-জোর নামগিয়াল তখন ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন, 1941 সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। নৈরাশ্য ও বেদনায় মহারাজা তাসী সংসার বিমুখ হয়ে নিজেকে শাসনকার্য থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে নিলেন, বিশেষ কোন জরুরী বিষয় ছাড়া তিনি আর কোন দিকেই দৃষ্টি দিতেন না। রাজপ্রাসাদের উত্তরের বারান্দায় বসে নৈসর্গিক চিত্রাঙ্কণে আত্মমগ্ন হয়ে তিনি জীবনের সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

মহারাজা তাসীর দ্বিতীয় পুত্র পল-দেন-থন-দুপকে রিমপোচে বা অবতার বলে মনে করা হতো। বাল্যকালে দার্জিলিং-এর সেন্ট পলস স্কুলে ও সিমলার বিশপ কটন স্কুলে পড়াশোনা শুরু করলেও, শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সিকিমের প্রথা অনুযায়ী লামাত্ব গ্রহণের জন্য তাকে পেমা-ইয়াংসি গোম্পায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু যুবরাজ পাল-জোরের মৃত্যুর পর আবার পল-দেন-থন-দুপকে ফিরিয়ে আনা হল এবং রাজপদের উপযোগী প্রশিক্ষণ দেবার জন্য তাকে দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পাঠ্যক্রমে ভর্তি করা হল।

প্রথম জন চেতনা ও গণ আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দলের জন্ম

অন্যদিকে চল্লিশের দশক থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ সিকিমের সুপ্ত চেতনাতেও আঘাত হানতে শুরু করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালী অধিবাসীরা সিকিমের ভুটিয়া-লেপচা সামন্ত প্রভুদের আধিপত্যে কখনই খুসী ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে সিকিমের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও বঞ্চনার ভিতরে নিপীড়িত বেগার শ্রমিক ও কৃষকের আত্মা গুমরে গুমরে কাঁদলেও মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় নি। তবু মাঝে মাঝে অসন্তোষ ও ক্রোধের দু-একটি স্ফুলিঙ্গ হঠাৎ কখনও জ্বলে উঠে ভিতরের চাপা আগুনের ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছিল। মহারাজা তাসী ও তাঁর সরকার সেই আভাস লক্ষ্য করে 1946 সালে সিকিমের রাজ্য পরিষদকে নূতন করে গঠন করলেন এবং লেপচা. ভুটিয়া ও নেপালী এই তিন জাতির সম-প্রতিনিধিত্বের জন্য সমান সংখ্যক আসন নির্ধারণ করলেন। এরপরই 1947 সালের 15 আগষ্ট স্বাধীন ভারতের বিজয় ভেরী ঈশাণের বিষাণ হয়ে বেজে উঠলো সিকিমের আকাশে। সেই নূতন আশার আলোয় সিকিমেরও প্রথম জন-জাগরণ চোখ মেলে তাকালো "কালো ভারী" আন্দোলনে, 1947 সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগে পৃথিবীর মানুষ যখন বিমানে আকাশ পরিভ্রমণের

সুযোগ লাভ করেছে তখন সিকিমে একমাত্র শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত একটি মাত্র পাকা সড়ক ছাড়া যানবাহন চলাচল করার মত আর কোন রাস্তা ছিল না। সিকিমের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করার একমাত্র বাহন ছিল টাট্টু ঘোড়া এবং যাবতীয় পণ্য ও মাল পরিবহণ করার জন্য একমাত্র উপায় ছিল টাট্টু ঘোড়ার চেয়েও কষ্ট সহিষ্ণু 'মূঢ় ম্লান মূক' কুলি বা ভারী নামক দ্বিপদ জন্তুদের পিঠ। স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য অঞ্চলের এই কুলি বা ভারীরা পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে 15/16 হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চড়াই পথে হেঁটে হেঁটে গিয়েছে দূর দূরান্তে। সিকিমের সামন্ত প্রভুদের বিভিন্ন এলাকায় জমি ও সম্পত্তি ছিল, সেখানে পণ্য আনা নেওয়ার জন্য এই কুলিদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিয়ে প্রায় বেগার শ্রম দিতে বাধ্য করা হত। সরকারী কর্মচারীরাও যখন বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করতে যেতেন তখন মালপত্র পরিবহণের জন্য তারা কুলি খরচা পেতেন, কিন্তু সেখানেও কারচুপি করে 50 জন কুলির মাল 20 জনকে দিয়ে পরিবহণ করিয়ে বাকী অর্থ তারা নিজেদের পকেটস্থ করতেন। ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার ও অন্যান্য ইংরেজ অভিযাত্রীরাও ব্যবসা সূত্রে বা রাজনৈতিক কাজে চীন, নেপাল, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি জায়গায় যাতায়াত করতেন এবং সেই সময় মাল পরিবহণের জন্য তারা সিকিমের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে কুলি বাহিনী সংগ্রহ করতেন। বলা বাহুল্য, তাদের ধার্য্য পারিশ্রমিকের অধিকাংশই আত্মসাৎ করতেন এই মধ্যস্থ ব্যক্তিরা। অবস্থা চরমে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। যুদ্ধের সময় সিকিমের এবং ভারতের কিছু কিছু কাজী ও ব্যবসায়ী পণ্য সামগ্রীর ব্যবসায় বিপুল অর্থ আয় করে, কিন্তু পণ্যবাহী কুলিদের আর্থিক উন্নতির দিকে তারা সামান্যতম উদার দৃষ্টি দিতে পারে নি। এই অমানুষিক কষ্ট ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের প্রকাশই 'কালো ভারী' আন্দোলন। বর্ষার সময় পিঠের বোঝাগুলিকে কালো আলকতরা মাখানো চট দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হ'তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য—সেই কালো রঙের বোঝা 'কালো ভারী' নামে প্রতীক হয়ে উঠলো বিক্ষোভ আন্দোলনের। সিকিমের কয়েকজন সমাজ সচেতন যুবক এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছিল। এদের মধ্যে সোনাম-শেরিং' এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (পরবর্তীকালে তিনি সিকিম বিধান সভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন)।

'কালো ভারী' আন্দোলন চরম আকার ধারণ করার আগেই সিকিম সরকার তা সহজেই দমন করে এবং কাজী, রায়ত ও সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে কুলিদের গ্রহণযোগ্য সমঝোতার দ্বারা মীমাংসা করতে সমর্থ হয়। এর প্রধান কারণ,

আন্দোলন পরিচালনা করার মত সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা বা দলীয় শক্তি তখনও সিকিমে গড়ে ওঠে নি। তবু এই প্রথম আন্দোলনের ফলে দুটি প্রত্যক্ষ লাভ হয়েছিল। প্রথমতঃ, সিকিমের জনসাধারণের মধ্যে যে একটি বিপ্লবী সত্তা জন্ম নিতে চলেছে তা সামন্ত প্রভুরা উপলব্ধি করতে পেরে ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এই আন্দোলনের নেতারাও এর থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন যে দলীয় সংগঠন, সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মপন্থা এবং বৃহত্তর জন-সমর্থন ব্যতীত কোন আন্দোলনই সার্থক হতে পারে না। এই ঘটনার পরই সিকিমে তিনটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়,—গ্যাংটকে সোনাম-শেরিং, তাসী-শেরিং ও কুলুঙ-তেনজিং-এর নেতৃত্বে "প্রজা সুধারক সমাজ", পশ্চিমের নেপালী প্রধান অঞ্চল টেমি টারকুতে গোবর্দ্ধন প্রধান ও ধন বাহাদুর তেওয়ারীর নেতৃত্বে "প্রজা সম্মেলন" এবং আরও পশ্চিমে চাকুং অঞ্চলে "প্রজা মণ্ডল"—এই দলের নেতৃত্ব দেন কাজী লেন-হুপ-দোর্জে, যিনি নিজেই সামন্ত প্রভু পরিবারের সন্তান ছিলেন। এই সময় দার্জিলিং ও সমতলের কিছু রাজনৈতিক কর্মীও সিকিমে এসে দল গঠনের কাজে এই নেতাদের সাহায্য করতে সক্রিয় হয়েছিলেন। দার্জিলিং-এর শ্রীমতী হেলেন লেপচা তাদের অন্যতম। এই তিনটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য ও সংযোগ স্থাপনের জন্য গ্যাংটকের 'প্রজা সুধারক সমাজ' দলের নেতারা একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে। 1947 সালের 7 ডিসেম্বর সিকিমের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজীর স্থাপন করল—গ্যাংটকের পোলো খেলার ময়দানে সেদিন এক বিশাল জনসমাবেশে এই তিন দলের নেতারা মিলিত হয়ে সিকিমের সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে সেচ্চার জেহাদ ঘোষণা করলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যেবেলা তিন দলের নেতারা মিলিত হয়ে "সিকিম রাজ্য কংগ্রেস" দলের জন্ম দান করেন এবং তাসী-শেরিং সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেখানে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে দলের পাঁচজন সদস্য তাদের তিন দফা দাবী নিয়ে মহারাজা তাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এই তিন দফা দাবী হল : (1) সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ, (2) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠন, (3) ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে সিকিমের অন্তর্ভূক্তি। 9 ডিসেম্বর তাসী-শেরিং সহ পাঁচজন সদস্য মহারাজা তাসীর হাতে তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। মহারাজা তাসী তাদের প্রথম দুইটি দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তৃতীয় দাবীটি অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে সিকিমের অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাবটি একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক

1935 সালের ভারত আইনে সিকিমকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্ত রাজন্য শাসিত রাজ্য রূপে গণ্য করে তার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভায় আসন সংরক্ষণ করা হলেও স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারত-সিকিম সম্পর্কের প্রশ্নটিকে এক অস্পষ্ট বিতর্কের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শক্তি পরাহত হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় স্বাধীন ভারতের বুকে যে দ্বন্দ্বের কাঁটাগুলি গোপনে রোপণ করে গিয়েছিল, সিকিম হল তার অন্যতম। এর কারণ, 1947 সালের শুরুতে, যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সম্ভাবনা দৃঢ়, সিকিমের মহারাজা ও তাঁর সচিবরা সিকিমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে ওঠেন। সেই সময় সিকিমে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার এ জে হপকিন্স-এর সহায়তায় সিকিমের প্রতিনিধিদল ঘন ঘন দিল্লীতে গিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করেন এবং সিকিমের রাজনৈতিক অবস্থা যে ভারতের অন্যান্য রাজন্য শাসিত রাজ্যের চেয়ে পৃথক তা প্রমাণ করতে সমর্থ হন। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারেরও পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। ফলে গণপরিষদের সদস্যগণও সিকিম ও ভুটান এই দুইটি রাজ্যের পরিস্থিতির বিশেষত্ব পরে আলাদাভাবে বিচার করার জন্য সাময়িকভাবে আলোচনা মুলতুবি রাখেন। সিকিমকে তাই বল্লভ ভাই প্যাটেলের জাতীয় সংহতি নীতির জালে বাঁধা হল না এবং প্রধানতঃ 1935 সালের ভারত আইনের উপর ভিত্তি করে রচিত ভারতীয় সংবিধানের আওতা থেকেও সিকিম আশ্চর্যভাবে পরিত্রাণ পেয়ে গেল।

এইভাবে আত্মরক্ষা হওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই সিকিম সরকার আরও সাহসী হয়ে উঠল। তাই, ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার দিন, 15 আগষ্টেই, সিকিম সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে এক স্মারক পত্র পাঠিয়ে দার্জিলিংকে সিকিমের অংশ হিসেবে ফেরৎ দেবার দাবী জানানো হল। স্মারক পত্রে আইন সঙ্গত যুক্তি দেখিয়ে বলা হয় যে, সিকিমের প্রাক্তন রাজা ব্যক্তিগতভাবে এক দানপত্রের মাধ্যমে এই ভূখণ্ডটি ব্রিটিশ সরকারকে দান করেছিল : সুতরাং ব্রিটিশ শাসন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই দানপত্রের অধিকারও শেষ হয়েছে। স্বাধীন ভারত একটি পৃথক রাজনৈতিক সত্তা—দার্জিলিং-এর উপরে তার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকার থাকতে পারে না। ভারতীয় নেতাদের সামনে এই স্মারক পত্র এক বিরাট চমক নিয়ে উপস্থিত হল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতারা তখন সদ্য প্রাপ্ত স্বাধীনতার নানা সমস্যায় বিব্রত, সিকিমের রাজনৈতিক শক্তি বা পরিস্থিতি সম্বন্ধেও তাঁদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। অন্যদিকে সিকিমের অভ্যন্তরেও 'সিকিম

রাজ্য কংগ্রেস' তথা রাজনৈতিক দল বিপ্লবী শক্তি নিয়ে মাথা তুলতে শুরু করেছিল। তাই উভয় পক্ষেরই সমঝোতা ও সিদ্ধান্ত করার আগে চিন্তার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনেই ভারত সরকার ও সিকিম সরকারের মধ্যে 1948 সালের 27 ফেব্রুয়ারী এক মধ্যবর্তী চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এতে উভয় দেশের মধ্যে নতুন কোন চুক্তি বা সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত 'all agreements, relations, and administrative arrangements as to matters of common concern existing between the Crown and the Sikkim State on August 14, 1947' অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। এই যৌথ বিষয়গুলি হল—মুদ্রা, শুল্ক, ডাক ও তার বিভাগ, বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা। এরফলে ব্রিটিশ সংরক্ষিত রাজ্য সিকিম এবার ভারতের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়ে সিংহাসনের দাবী রক্ষা করতে সমর্থ হল। এরপর সিকিমে প্রথম ভারতীয় রাজনৈতিক সচিব হিসেবে যোগ দিলেন শ্রী হরিশ্বর দয়াল।

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যুবরাজ পল-দেন-থন-দুপ এর আবির্ভাব

মহারাজা তাসী শাসন কার্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার ফলে যুবরাজ পল-দেন-থন দুপ তখন প্রকৃত শাসক হয়ে উঠেছিলেন। সিকিমে তিনি 'মহারাজ-কুমার' নামে সম্বোধিত হলেও, মহারাজার সমস্ত দায়িত্ব বহন করতেন তিনিই। ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনিই দিল্লীতে সিকিমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দরবার করেন এবং ভারত ভুক্তির সম্ভাবনা থেকে সিংহাসনের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। এবার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলের সংগ্রামের হাত থেকে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করা তাঁর প্রধান চিন্তার কারণ হয়ে উঠলো। মহারাজকুমার পল-দেন-থন-দুপ এর পৃষ্ঠপোষকতায় অল্পদিনের মধ্যেই 'সিকিম রাজ্য কংগ্রেস দল'-র প্রতিপক্ষ রূপে 'সিকিম ন্যাশনাল পার্টি' নামে অন্য একটি দল তৈরী হয় (30 এপ্রিল, 1948)। মহারাজা তথা সরকার পন্থী ভূস্বামী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরাই এই নূতন দলের সদস্য ও সমর্থক হয়েছিলেন। দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার মূল বক্তব্য হল, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সিকিমের অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং *Status quo* বা রাজতন্ত্র বজায় রেখে ভারতের সঙ্গে আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। সিকিম রাজ্য কংগ্রেস ও সিকিম ন্যাশনাল পার্টি—এই দুই দলের উদ্ভবের ও সিদ্ধান্তের মধ্যে স্বার্থ সংঘাতের নগ্ন রূপ প্রকটিত হয়ে উঠলো। জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করার আশার প্রতিবন্ধকতা করার জন্যই যে সিকিম ন্যাশনাল পার্টির জন্ম তা

বুঝতে কারও অসুবিধে হয় নি। সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা এবার তাই সম্মুখ সমরে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। 1949 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রঙপো-তে এই দলের বাৎসরিক সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং বিপুল জন-সমাবেশে 'খাজনা নয়' আন্দোলনের অর্থাৎ সিকিমের সাধারণ প্রজারা এরপর রাজা, কাজী বা ভূস্বামী, জমি বা গৃহের মালিক কাউকেই কোন খাজনা বা ভাড়া না দেওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে দলের নেতা ও কর্মীরা বিভিন্ন বস্তী (গ্রাম) অঞ্চলে গিয়ে জনমত শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই সম্মেলনের পরেই সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় নেতাকে সিকিম সরকার গ্রেপ্তার করে। কিন্তু এরফলে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে এবং সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্য ও কর্মীরা এক বিশাল মিছিল নিয়ে গ্যাংটকে এসে রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে। কিন্তু অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার আগেই ভারতীয় রাজনৈতিক সচিবের হস্তক্ষেপে মিছিলকারীদের শান্ত করে একটি মীমাংসার সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং মহারাজা যথাশীঘ্র একটি মধ্যবর্তী সরকার গঠন করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। 1949 সালের মে মাসে সিকিম রাজ্য কংগ্রেস থেকে তিনজন ও মহারাজার মনোনীত দুইজন সদস্যকে নিয়ে পাঁচজন সদস্যের এক পরিষদ গঠন করা হয়। সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের দাবী ছিল, নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা ও একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসন পরিচালনা করা। মহারাজার পক্ষে এই দাবী স্বীকার করা ছিল অসম্ভব। ফলে পরিষদে রাজ্য কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এরপর সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাধ্য হয়ে মহারাজা ঐ পরিষদ ভেঙে দিয়ে রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন (জুন, 1949 সাল)। ভারতীয় রাজনৈতিক সচিব হরিশ্বর দয়ালকে সাময়িক ভাবে তখন কার্য নির্বাহক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয় এবং শাসন পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত করা হয়। পাঁচ সদস্যের এই পরিষদ যদিও মাত্র একমাস স্থায়ী হয়েছিল তবু সিকিমের ইতিহাসে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এর অবদান অনস্বীকার্য।

এরপর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মহারাজার শাসন পরিচালনার কাজে সহায়তা করার জন্য একজন ভারতীয় 'দেওয়ান' নিযুক্ত করার প্রস্তাব পাঠানো হয়। মহারাজা সেই প্রস্তাবে সম্মত হন। 1949 সালের আগষ্ট মাসে শ্রী জে. এস. লাল,

আই. সি. এস. সিকিমের মহারাজা কর্তৃক দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে শাসন রথের সারথীরূপে কার্যভার গ্রহণ করলেন। সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা হঠাৎ পরিষদ ভেঙে দেওয়া ও ভারতীয় দেওয়ান নিযুক্ত করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রতীক হিসেবে অনেকে মাথায় খদ্দরের সাদা গান্ধী টুপিও পরতো, ভারতের সঙ্গে সিকিমের সংযুক্তি ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। হঠাৎ ভারত সরকারের এই আচরণ তাদের কিছুটা সন্দিগ্ধ করে তুললো, কিছুটা বিভ্রান্ত ও হতাশ করে তুললো। কিন্তু জে. এস. লাল কিছুদিনের মধ্যেই সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের দুইজন এবং সিকিম ন্যাশনাল পার্টির দুইজন সদস্যকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন, তিনি স্বয়ং সেই কমিটির সভাপতি হন। এই কমিটি গঠন করে সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের সদস্য ও নেতাদের সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করা হয় মাত্র, এতে তাদের ক্ষোভ বৃদ্ধি হয় শুধু। ভারত সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিনিধি দিল্লীতে যান (মার্চ, 1950)। কিন্তু তার আগেই সিকিম সম্বন্ধে ভারতের নীতি স্থির হয়ে গিয়েছিল। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে 20 মার্চ, 1950 সালে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়, যাতে স্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, সিকিমের মহারাজার প্রতিনিধি হিসেবে মহারাজকুমার ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে : 'Sikkim will continue to be a protectorate of India. The Government of India will continue to be responsible for its external relations, defence and communications...As regards internal government, the state will continue to enjoy autonomy subject to the ultimate responsibility of the Government of India for the maintenance of good administration and law and order.' তবে এই ইস্তাহারে জনপ্রিয় সরকার গঠনের আশা একেবারে ধূলিসাৎ করা হয় নি, এবং সেই বিষয়ে যে নীতি গ্রহণ করা হয় তা হল, 'For the present an officer of the Government of India will continue to be the Dewan of the state. But the Government of India's policy is one of progressive association of the people of the state with its Government, a policy with which, happily. His Highness the Maharaja is in full agreement. It is proposed as a first step, that an Advisory Council, representative of all the interests, should be associated with the Dewan. Steps

will also be taken immediately to institute a Village Panchayat System on an elective basis within the state.'

সিকিমের জনগণকে জনপ্রিয় সরকার গঠন করার অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যেই এই প্রাথমিক ব্রিটিশ নীতি প্রতিধ্বনির মত সিকিমের গণ-আন্দোলনের উৎসাহে এক আচ্ছাদন বিছিয়ে দিল। এরপর 1950 সালের 5 ডিসেম্বর ভারত-সিকিম চুক্তি সম্পাদিত হল, স্বাক্ষর করলেন মহারাজা তাসী এবং ভারতের পক্ষে হরিশ্বর দয়াল। তেরটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই চুক্তিতে উভয় দেশের সম্পর্ক, দায়িত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এবার ভারতের 'সংরক্ষিত রাজ্য' হিসেবে সিকিমের ইতিহাসের আরেক নূতন অধ্যায় শুরু হল।

গ্রাম-পঞ্চায়েত নির্বাচন ঃ সাম্প্রদায়িক বিভেদ

1950 সালের ডিসেম্বর মাসেই সিকিমে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। কিন্তু রাজপরিবার সমর্থিত সিকিম ন্যাশনাল পার্টি এই নির্বাচনে সিকিমের ভূটিয়া-লেপচা অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় নি, এই অজুহাতে নির্বাচন বয়কট করে। এরফলে এবার ভুটিয়া-লেপচা বনাম নেপালী— এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সিকিমের রাজনৈতিক চরিত্রের অন্যতম উপসর্গ হয়ে ওঠে। অবশ্যম্ভাবীরূপেই সেই বিভেদের প্রভাব সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের ঐক্যেও ফাটল ধরাতে শুরু করে। সিকিমের রাজনৈতিক আন্দোলনের এতদিনকার রূপটি ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের সংগ্রাম। এবার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলনের গতিও বিভিন্নমুখী হয়ে যায় এবং দলের সংগঠন ক্রমে শিথিল হতে শুরু করে। যেহেতু সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে নেপালীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই এটি নেপালী দল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় এবং অনেক ভুটিয়া ও লেপচা সদস্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। দলের সভাপতি তাসী-শেরিং, যদিও জাতিতে ভুটিয়া ছিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক নীতির উর্দ্ধে দলকে স্থান দিয়ে সিকিম রাজ্য কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ভুটিয়া-লেপচা বনাম নেপালী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের ফাঁক ক্রমশই বিস্তৃততর হতে থাকে।

এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে নূতন রাজ্য পরিষদ (State Council) গঠন করার প্রস্তাবে উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন এবং জাতি-ভিত্তিক

আসন বণ্টনের দাবী ওঠে। এই বিষয়ে সমঝোতার জন্য 1951 সালের মার্চ মাসে এক ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করা হয়—রাজ্য কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ, ন্যাশনাল পার্টির কয়েকজন প্রধান সদস্য এবং মহারাজার পক্ষে মহারাজ-কুমার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এতে যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয় তা হল, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষদ গঠন, ভুটিয়া-লেপচা ও নেপালী এই দুই প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে সমানুপাতিক হারে আসন বণ্টন এবং যথাসম্ভব শীঘ্র নির্বাচনের আয়োজন করা। 1952 সালের জানুয়ারী মাসে মহারাজার স্বাক্ষরিত একটি 'ঘোষণা পত্র' প্রকাশ করা হয় এবং তাতে নির্বাচন পদ্ধতি, আসন বণ্টনের নীতি, নির্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধির সংখ্যা, প্রার্থী ও নির্বাচক মণ্ডলীর বয়স ও যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে একটি খসড়া পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন পক্ষ থেকে এই খসড়া পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিভিন্ন আপত্তি ও বিরোধিতা দেখা দিলে তা আবার পুনর্বিবেচনার জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। অবশেষে 1953 সালের 23 মার্চ মহারাজার স্বাক্ষরিত একটি চূড়ান্ত 'ঘোষণা পত্র' জারি করা হয়,—এটি 'সাংবিধানিক ঘোষণা' নামে প্রখ্যাত। এই ঘোষণাতে বলা হয় যে, (ক) সিকিমে দুইটি পরিষদ গঠন করে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে, একটি রাজ্য পরিষদ ও অপরটি কর্ম পরিষদ ; (খ) শাসনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকেও দুইটি তালিকাতে বিভক্ত করা হবে—(i) সংরক্ষিত বিষয় যা মহারাজার একান্ত ব্যক্তিগত শাসনের অধিকারে থাকবে এবং (ii) হস্তান্তরিত বিষয় যা মহারাজা জন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত পরিষদের হাতে সময়ে সময়ে বণ্টন করে দেবেন ; (গ) রাজ্য পরিষদের সদস্যদের যদিও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে কিন্তু মহারাজার পূর্ব সম্মতি ব্যতীত সংরক্ষিত বিষয়ে আইন প্রণয়নের কোন অধিকার থাকবে না ; (ঘ) রাজ্যের বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বিশেষ কয়েকটি বিষয় ছাড়া রাজ্য পরিষদের সদস্যদের ভোট দানের অধিকার থাকবে না। উক্ত ঘোষণাতে রাজ্য পরিষদের গঠন সম্পর্কে যে নীতি গৃহীত হয় তা হল—মহারাজার মনোনীত একজন সভাপতি, বার জন নির্বাচিত সদস্য এবং পাঁচ জন মহারাজার মনোনীত সদস্য, মোট সতের জন সদস্য দ্বারা গঠিত হবে। বার জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ছয় জন ভুটিয়া-লেপচা গোষ্ঠীর এবং ছয় জন নেপালী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি থাকবে। এছাড়া মনোনীত সদস্যদের মধ্যে একজন পেমা-ইয়াংসি গোম্পার লামাদের মধ্যে থেকে লামা-প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

কর্ম পরিষদের (একজিকিউটিভ কাউন্সিল) গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উক্ত

ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, ভারতীয় দেওয়ান পদাধিকারী ব্যক্তি এই পরিষদের সভাপতি থাকবেন এবং রাজ্য পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে মহারাজা কয়েকজন সদস্যকে সময়ে সময়ে কর্ম পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করবেন। মহারাজা কর্ম পরিষদের হাতে সময়ে সময়ে যে ক্ষমতা অর্পণ করবেন এই সদস্যরা শুধু সেইটুকুই প্রয়োগ করতে পারবেন। কর্ম পরিষদের সদস্যরা তাদের শাসন সংক্রান্ত কাজের জন্য মহারাজার কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে দায়িত্বশীল থাকবেন এবং মহারাজার সন্তুষ্টির উপরে তাদের কার্যকাল নির্ভর করবে।

প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও তার পরিণাম

1953 সালের আগষ্ট মাসে সিকিমের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা নির্বাচনের পদ্ধতি, আসন বণ্টন ও ক্ষমতা বণ্টনের নীতিতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এই রাজ্য পরিষদ যে মহারাজার ইচ্ছাধীন জন প্রতিনিধিত্বের প্রহসন মাত্র, তা উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধে ছিল না। তবু সিকিম রাজ্য কংগ্রেস এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। কারণ সম্ভবত সাংবিধানিক ঘোষণার সপক্ষে ভারত সরকারের অনুমোদন থাকাতে, নির্বাচন বর্জন করা ভারত-বিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক বলে ব্যাখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। নির্বাচনে ছটি নেপালী আসনে সিকিম রাজ্য কংগ্রেস এবং ছয়টি লেপচা-ভুটিয়া আসনে ন্যাশনাল পার্টি জয় লাভ করে। মহারাজার মনোনীত প্রতিনিধিরা যে ন্যাশনাল পার্টির সপক্ষে গিয়ে তাদের শক্তিকেই বৃদ্ধি করবে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ ছিল না। সুতরাং রাজ্য পরিষদের সীমিত ক্ষমতা এবং প্রতিনিধিত্বের অসাম্য গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের স্বপ্নকে যেমন স্বপ্নের জগতেই নিক্ষিপ্ত করেছিল, নেপালী অধিবাসীদের অন্তরে তেমনি ভুটিয়া গোষ্ঠী বিরোধী ঈর্ষার আগুনকে ইন্ধন জোগাতে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া, নূতন শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় দেওয়ান ও কর্ম পরিষদকে যে ভাবে মহারাজার অনুগত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছিল তা আই. সি. এস., জে. এস. লালের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি 1954 সালে সিকিম ত্যাগ করেন এবং তার জায়গায় আসেন শ্রী এন. কে. রুস্তমজী। রুস্তমজী ছিলেন দেরাদুনে মহারাজকুমারের সহপাঠী তথা রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারত সরকার প্রদত্ত নামের তালিকা থেকে তাই তাঁকেই দেওয়ান পদের জন্য মনোনীত করা হয়। অবশ্য প্রকৃত মনোনয়ন করেন মহারাজকুমার পল-দেন-থন-দুপ, যিনি তখন শাসন ক্ষমতার প্রকৃত কাণ্ডারী। পূর্ব পরিচিত বন্ধু এই

দেওয়ানের পক্ষে যে মহারাজা তথা রাজদরবারের বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব হবে না তা জেনেই রুস্তমজীকে সাগ্রহে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে রুস্তমজী পরবর্তীকালে তাঁর '*Enchanted Frontier*' বইতে লিখেছেন,—'My embarrassment is that I know too much, and I value my friendship too dearly to be prepared to abuse them.' তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 1953 সালের নির্বাচন সিকিমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের ভিত্তিকেই আরও মজবুত করে তুলেছিল।

1954 সালে সিকিমে সপ্ত-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাজ্যের উন্নয়নে প্রায় 32.4 কোটি টাকার এক বাজেট প্রস্তুত করা হয়। বলা বাহুল্য, বাজেটে বরাদ্দ সমস্ত অর্থই এসেছিল ভারত সরকারের ভাণ্ডার থেকে। পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রসারণ, কুটীর শিল্প, গৃহ নির্মাণ ও জল বিদ্যুৎ প্রকল্প গঠন বিষয়গুলিতে। সিকিমে সেই প্রথম এই ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা সূচী গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ও রূপায়ণে দেওয়ান রুস্তমজীর অবদান অনস্বীকার্য।

সিকিমের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1958 সালে। যদিও 1953 সালের ঘোষণা পত্রে তিন বছর অন্তর রাজ্য পরিষদের নির্বাচনের সময় ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণে অপর এক ঘোষনায় এই কার্যকালের মেয়াদ 1957 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। 1958 সালের নির্বাচনে রাজ্য পরিষদের আসন সংখ্যা এবং আসন সংরক্ষণের নীতিতেও কিছু পরিবর্তন করা হয়—এবার ভুটিয়া-লেপচা গোষ্ঠীর ছয় জন, নেপালী গোষ্ঠীর ছয় জন, মহারাজার মনোনীত ছয় জন, সঙ্ঘ বা গোম্পার একজন এবং সাধারণ আসনে এক জন—অর্থাৎ মোট কুড়িটি আসন ধার্য করা হয়। এই নির্বাচনে সিকিম রাজ্য কংগ্রেস নেপালী আসনের ছয়টি, ভুটিয়া-লেপচা আসনে একটি এবং সাধারণ আসনটিতে জয় লাভ করে মোট আটটি সদস্য পদ অর্জন করতে সমর্থ হয়। কিন্তু নির্বাচিত আসনগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও রাজ্য পরিষদের মোট আসন সংখ্যা অনুসারে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা হল না।

1958-59 সালে চীন-তিব্বত সংঘর্ষের ফলে তিব্বতের সন্ন্যাসী শাসক দালাইলামা প্রায় ষাট হাজার তিব্বতী উদ্বাস্তুকে নিয়ে লাসা ত্যাগ করে ভারত সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সময় সিকিম সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাঁচ হাজার উদ্বাস্তুকে সিকিমে পুনর্বাসন দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই বদান্যতার পিছনে ধর্মীয় ঐক্য

যতটা প্রেরণা দিয়েছিল, রাজনৈতিক স্বার্থ চেতনাও ততখানিই উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে মনে করা অমূলক নয়। সিকিমে এরমধ্যেই নেপালীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ হয়েছিল, তাই এই তিব্বতী উদ্বাস্তুদের এনে ভুটিয়া-লেপচা গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে জাতীয় সমতা রক্ষার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ছিল বলে মনে করা হয়। তাছাড়া উদ্বাস্ত তিব্বতী লামারা সিকিমের বিভিন্ন গোম্পায় সংযুক্ত হয়ে লামাতন্ত্রের প্রভাব বিস্তার করবে এমন একটি আশাও হয়তো এর পিছনে কাজ করেছিল। তিব্বতের কার-গিউক-পা সম্প্রদায়ের প্রধান লামা ষোড়শ অবতার গ্যাল্যা করমা-পা লামাকেও এই সময় সিকিমে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং এই সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত হয় বিখ্যাত 'রূমটেক' গোম্পাটি। এর জন্য বিশাল আয়তনের জমি ও বিপুল পরিমাণ অর্থও সিকিম সরকারের তহবিল থেকে দান করা হয়।

এই সময়েই মহারাজকুমার পল-দেন-থন-দুপের উদ্যোগে নির্মাণ করা হয় সিকিমের নাম-গিয়াল ইনসটিটিউট অব টিবেটোলজি" নামে বিখ্যাত তিব্বতী চর্চার প্রতিষ্ঠানটি। 1957 সালে দালাই লামা এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু 1958 সালে এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে 'সিকিম রিসার্চ ইনসটিটিউট অব টিবেটোলজি' করা হয় এবং 1982 সালে ঐ নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয় 'এণ্ড আদার বুডটিষ্ট ষ্টাডিজ' শব্দগুলি। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের পিছনে মহারাজা তাসী ও মহারাজকুমার পল-দেন-থন-দুপ-এর উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত দানের কথা অস্বীকার করলে এক ঐতিহাসিক সত্যকেই উপেক্ষা করা হবে।

ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ শেষ হওয়ার পর সিকিমের রাজশক্তি আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে সার্বভৌম ও সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা ফিরে পেয়েছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক চরম ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবণতাও পরে প্রকট হয়ে উঠেছিল। ষাটের দশক পর্যন্ত ভারত সরকার সিকিমের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে নি, যদিও রাজ্যের উন্নয়নের যাবতীয় অর্থ আসছিল ভারতের ভাণ্ডার থেকেই। সিকিমের রাজ্য পরিষদ ও কর্মপরিষদ দুটিতেই মহারাজার অনুগত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য ছিল। এমনকি সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যেও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ফলে মহারাজা তথা রাজদরবার ঘেঁষা মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং এই প্রতিনিধিদের মধ্যে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করার উৎসাহও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছিল। মহারাজা তাসী তখন বৃদ্ধ ও প্রায় অক্ষম, মহারাজকুমার পল-দেন-থন-দুপ সব ক্ষমতার সর্বময় একছত্র অধীশ্বর। এ অবস্থায় যারা সত্যই গণতান্ত্রিক সরকার

গঠন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন তারা সিকিম রাজ্য কংগ্রেস ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে কাজী লেন-ড্রুপ দোর্জের নেতৃত্বে আরেকটি নতুন দল গড়লেন, 'সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে (1960)। সোনাম-শেরিং, চন্দ্রদাস রাই প্রভৃতি রাজ্য কংগ্রেসের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা এই নতুন দলের ছত্রছায়ায় এসে মিলিত হলেন। দল পরিচালনা করার আসল মস্তিষ্ক হল 'কাজিনী' অর্থাৎ শ্রীমতী এলিসা মারিয়া নামে কাজী লেন-ড্রুপ দোর্জের বিদেশিনী স্ত্রী। ইনিই দলের প্রধান পরামর্শ-দাতা এবং প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। এই নূতন দল বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি, রাজ্য পরিষদ ও কর্ম পরিষদের গঠন ও ক্ষমতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলো। দলের পক্ষ থেকে দাবী করা হল—(1) দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, (2) লিখিত সংবিধান প্রণয়ন এবং (3) সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার। দাবীগুলিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরেই সিকিম সরকার রাজ্যের নাগরিকত্ব অর্জন করার বিষয়ে একটি আদেশ জারি করে এবং তাতে সিকিম প্রজা বা নাগরিকত্ব লাভ করার জন্য কতকগুলি শর্ত আরোপ করা হয়। এই শর্তগুলি যে প্রকারান্তরে নেপালী অধিবাসীদের ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য হয়েছিল, সে কথা বলা বাহুল্য। সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস এই আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের সদস্যরাও এই আদেশের বিরুদ্ধে এবার ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। অবশেষে ভারত সরকারের মধ্যস্থতায় ঐ আদেশ পরিবর্তিত ও সংশোধিত রূপে প্রকাশ করা হয়[1]। 1962 সালে, পূর্ব ঘোষিত নিয়ম অনুসারে রাজ্য পরিষদের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আবার বিশেষ এক ঘোষণায় তা স্থগিত রাখা হয়। চীন-ভারত যুদ্ধ ও জরুরী অবস্থার ঘোষণা এর অন্যতম কারণ ছিল। সিকিমের অভ্যন্তরেও জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তিব্বত-সিকিম সীমান্তগুলিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসেবে সীমান্তদ্বারগুলিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরফলে সিকিমের যে সমস্ত অধিবাসী এতদিন চুম্বীতে বসবাস করছিল তারা সিকিমে চলে আসতে বাধ্য হয় এবং চুম্বীর সঙ্গে সিকিমের সম্পর্ক এবার একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

---

1. Sikkim Subjects Regulation, 1961

বিদেশিনী গ্যাল-মো ও ভারত বিদ্বেষের সূচনা

ঠিক এই সময় সিকিমের রাজনৈতিক আকাশে উদয় হয় আরেক ধূমকেতু। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে মহারাজকুমার পল-দেন-থন-দুপ নাম-গিয়ালও সাঙ-গে ডিক্কি নামে তিব্বতের এক অভিজাত পরিবারের মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন (1950)। এই মহিলা তিব্বতের সপ্তম দালাই লামার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সুগুণ সম্পন্না ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্মের পরে 1957 সালে তিনি হঠাৎ মারা যান। জীবনের প্রারম্ভেই প্রিয়তমা এই পত্নীকে হারিয়ে মহারাজকুমার পল-দেন-থন দুপ অত্যন্ত মর্মাহত হন। এরপর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, কর্মচারী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর বিবাহ করতে রাজী হলেন না। কিন্তু তাঁর অজান্তেই ভাগ্য তাঁকে এক বিচিত্র পথে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় ছয় বছর বিপত্নীক জীবনযাপন করার পর, 1962 সালের ডিসেম্বর মাসে, দার্জিলিং-এর এক নামী হোটেলে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সুন্দরী মার্কিন দুহিতা হোপ কুক্-এর (Hope Cook), আর প্রথম দর্শনেই প্রেম। মৃতদার মহারাজকুমার এবার নিজেই যখন ঐ মার্কিনী মহিলাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তখন আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে রাজ্যের কেউই সেটা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। কিন্তু প্রেম দুর্বার, পিতা মহারাজা তাসী অসমর্থ বৃদ্ধ এবং নায়ক স্বয়ং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত,—তাই সেই সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করার বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো ছিল না। 1963 সালের মার্চ মাসে অত্যন্ত তাঁকে জাঁক জমকের সঙ্গে রাজ প্রাসাদ সংলগ্ন তুঘ-লা-খাঙ গোম্পায় বৌদ্ধধর্মের বিধি অনুসারে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এই মার্কিনী কন্যার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তিব্বতী রক্তোদ্ভূত মহারাজকুমারের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। দেশবিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে এই বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রের, বেতার ও দূরদর্শনের প্রতিনিধিরা, সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রচার করা হল এই বিবাহের সংবাদ। পরে অবশ্য আইনের জটিলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই বিবাহকে আইনানুসারে রেজিস্ট্রি করা হয়।

বিবাহের পর মহারাজা পল-দেন-থন-দুপ যেন নিয়তির অমোঘ আহ্বানে ছুটে চললেন অজানা অদৃশ্য পথে। 1963 সালের ডিসেম্বর মাসেই মহারাজা তাসী পরলোক গমন করেন। মহারাজকুমার এবার আইনতঃ এই রাজ্যের 'মহারাজা' রূপে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে অভিষেক অনুষ্ঠান অনাড়ম্বরভাবে শুধু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অনুসারে তখনকার মত পালন করা হয়

এবং এ বিষয়ে উৎসব পরে উদ্‌যাপন করা হবে বলে জানানো হয়। এরপর 1965 সালের 4 এপ্রিল মহারাজার 42-তম জন্মদিনে বিপুল সমারোহে সেই অভিষেক অনুষ্ঠানের উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বহু বিদেশী অতিথি, কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও রাজদূতের সমাবেশে ক্ষুদ্র সিকিম সেদিন আবার বিশ্বের সংবাদের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সিকিমের মানুষরা তাদের স্মরণকালের মধ্যে এমন উৎসব, এমন সমারোহ দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করে নি। আর এই উৎসবের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় করা হয়েছিল তা দেখেও সিকিমবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই উৎসবের আরও একটি বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল—ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'মহারাজা' উপাধি বর্জন করে পল-দেন-থন-দুপ সিকিমের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে নিজেকে আবার 'চো-গিয়াল' বা ধর্মরাজা বলে ঘোষণা করলেন। আর বিদেশিনী হোপ কুক হলেন 'গ্যাল-মো' বা ধর্মরানী। উপাধি পরিবর্তনের এই ঘটনায় সেদিন কারো মনেই কোন সন্দেহ জাগে নি। তখন ভারত সরকারও এই 'চো-গিয়াল' উপাধি সানন্দেই স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু এর পিছনে যে এক গভীর উদ্দেশ্য ছিল তা ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে।

1962 সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার দুজন গবেষক কারন ও জেনকিন্স একটি বই প্রকাশ করেন, *The Himalayan Kingdoms : Bhutan, Sikkim, and Nepal* নাম দিয়ে। এতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আছে,—'The Himalayan kingdoms could conceivably join in some kind of federation. Such a political and economic union would of course, enhance the possibility of the establishment of a buffer 'Asian Switzerland' between communism and democracy in India.' এই বিষয়ে আরও উল্লেখ ছিল যে এ ধরণের ফেডারেশন গঠিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় অভিভাবকত্ব দিতে আগ্রহী থাকবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে এই পার্বত্য রাজ্যগুলির উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকা দীর্ঘদিন থেকেই উৎসুক হয়েছিল সিকিমের ভৌগলিক অবস্থানের গুরুত্ব বিবেচনা করে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে তাই দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রসর হচ্ছিল। আজ অনেকেই বিশ্বাস করেন যে সিকিমকে ভারতবর্ষের প্রভাব থেকে মুক্ত করে মার্কিনী বঁড়শিতে গেঁথে তোলার জন্যই রূপসী হোপ কুক-কে সেদিন টোপ হিসেবে এখানে

পাঠানো হয়েছিল। 'চো-গিয়াল' উপাধি গ্রহণের পিছনে যে কুক-এরই ইন্ধন ছিল সে কথা সিকিমের তৎকালীন সরকারী মহলের অজানা ছিল না। এই উপাধি গ্রহণের দ্বারা সিকিমের স্বাতন্ত্র প্রমাণ করারই প্রকৃত প্রয়াস ছিল, অর্থাৎ তিনি ভারতীয় 'মহারাজা' নন।

অভিষেক অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে মহারাজা পল-দেন-থন-দুপ হঠাৎ সিকিম রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেন। এই রক্ষীবাহিনী পোষণের খরচাও বহণ করতে হতো ভারতকেই। তখনও ভারত সরকারের কাছে সন্দিগ্ধ হওয়ার মত বিশেষ কোন খবর পৌঁছায় নি। এজন্য সিকিমের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধের কথা চিন্তা করে ভারত সরকার সেই আবেদন অনুমোদন করেন। এই অবসরে সিকিম রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু তারপরেই ভারত সরকারের সচকিত হওয়ার পালা শুরু হয়—স্বাধীন রাষ্ট্রের নিয়ম অনুসারে চো-গিয়াল পল-দেন-থন-দুপ এই রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের বাৎসরিক পদক ও সম্মান দান করার জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হল। এই সময়ই সিকিমের নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীত রচনা করা হয় এবং বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠানে তা গীত হতে থাকে। এই জাতীয় সঙ্গীত রচনার মধ্যে এক বিশেষ ইঙ্গিতের আভাস পেয়ে ভারত সরকার এবার রাজ দরবারের আচরণের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করেন। 1966 সালের জুলাই মাসে গ্যাল-মো হোপ কুক '*Bulletin of Tibetology*' পত্রিকায় '*The Sikkimese Theory of Land-Holding and The Darjeeling Grant*' শিরোনামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এতে ভারতের অংশ হিসেবে দার্জিলিং-এর বৈধতা ও আইনগত যৌক্তিকতার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলা হয় এবং প্রাচীন ইতিহাসের নজীর দেখিয়ে দার্জিলিংকে সিকিমের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও আলোড়ন শুরু হয়, ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও এ বিষয়ে মুখর হয়ে ওঠে। অবশেষে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চো-গিয়ালের সঙ্গে আলোচনা করে এই প্রবন্ধের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয় এবং বিষয়টি সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া হয়।

চো-গিয়াল ও তাঁর কিছু অনুগত ভক্তের মধ্যে যে ক্রমশ ভারত-বিদ্বেষী মনোভাব ঘনীভূত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল তার দু একটি করে স্ফুলিঙ্গও ক্রমশ বাইরে ফুটে বেরোতে লাগলো। সিকিমের কিছু শিক্ষিত তরুণ সরকারী কর্মচারীকে নিয়ে 'ইয়ুথ স্টাডি ফোরাম' নামে এক সংগঠন তৈরী করা হয়। এতে চো-গিয়ালের

একান্ত স্নেহভাজন ও বিশ্বস্ত কয়েকজনকেই মাত্র সদস্য করা হয় এবং তাঁর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় এর কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আসলে এই ফোরামের সদস্যদের প্রধান ভূমিকা ছিল গোয়েন্দাগিরি করা এবং সরকারী, বে-সরকারী সূত্র থেকে বিভিন্ন গোপন খবর সংগ্রহ করে চো-গিয়ালের কানে পোঁছান। অনেকে ব্যঙ্গ করে এই ফোরামের সদস্যদের নাম দিয়েছিল 'ইয়ং টার্কস'। চো-গিয়ালের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে এই যুবকদের কণ্ঠ আরও জোরাল হয়ে উঠলো, কাজকর্ম ও গতিবিধিও দুঃসাহসের পরিচয় দিতে শুরু করলো। ক্রমে তারা ভারত-সিকিম সম্পর্ক নিয়ে মুক্ত কণ্ঠে সমালোচনা করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হল না। 1967 সালের জুন মাসে কর্ম পরিষদের তিনজন সদস্য এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে 1950 সালের ভারত-সিকিম চুক্তির সংশোধন ও পরিবর্তনের দাবী জানিয়ে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে যে, "1947 সালের 15 আগষ্ট সিকিম সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে।"

1967 সালে সিকিমের তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনেও রাজ্য পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং আসন বণ্টন পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়। যথাক্রমে—ভুটিয়া-লেপচা—7, নেপালী—7, সাধারণ আসন—1, সঙ্ঘ বা গোম্পা—1, চোঙ বা লিম্বু জাতি—1, তপশিলী জাতি—1 এবং রাজ দরবারের মনোনীত সদস্য—6, মোট 24 জন প্রতিনিধি। এই নির্বাচনে সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস দলের সভাপতি কাজী লেন-দুপ দোর্জে সহ মোট আট জন প্রার্থী জয়লাভ করলেও কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে সমর্থ হয় না। ফলে চো-গিয়াল তথা রাজদরবারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা অব্যাহত থেকে যায়। নির্বাচনের আগে ও ফল ঘোষণার সময়ে 'স্বাধীন সিকিম জিন্দাবাদ' ধ্বনিও উচ্চ কণ্ঠে নিনাদিত হতে থাকে।

এই ধরণের প্রচার ও দাবীর পিছনে যে বিশেষ কোন মস্তিষ্ক বা বিশেষ কোন চক্র ইন্ধন জোগাচ্ছে তা ক্রমশই স্বচ্ছতর হয়ে উঠছিল। সেই চক্রান্তের চরম বিস্ফোরণ ঘটলো 1968 সালের 15 আগষ্ট। প্রতি বছরই সিকিমে ভারতীয় রাজনৈতিক সচিবের সরকারী নিবাসে স্বাধীনতা দিবসের উৎসব পালন করা হতো ও পতাকা উত্তোলন করা হতো। সিকিমের মহারাজাসহ সমস্ত বিশিষ্ট অধিবাসীই এতদিন তাতে যোগ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সেদিনের ঐ অনুষ্ঠানের সময় সিকিমের কয়েকজন ব্যক্তি কিছু সংখ্যক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মিছিল করে এসে সেই নিবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ও ভারত-বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকে। স্বয়ং চো-গিয়াল সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর হস্তক্ষেপে এই বিক্ষোভ-

কারীরা বিশেষ কোন হাঙ্গামা না করে ফিরে গেলেও এই ঘটনা দিল্লীর সরকারী মহলে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চো-গিয়ালের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়। এরজন্য চো-গিয়ালও ভারত সরকারের কাছে প্রত্যুত্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিষয়টি সাময়িকভাবে শান্ত হলেও, ফোরামের কাজকর্ম ও সিকিমের রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্বন্ধে ভারত সরকার সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করেন।

ভুটিয়া ও লেপচা জোটে ভাঙ্গনের প্রচেষ্টা

এই সমসাময়িক কালে সিকিমের রাজনৈতিক জগতে ভুটিয়া রাজতন্ত্র, ভারতীয় সংরক্ষণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন,—এই ত্রি-পাক্ষিক শক্তি-দ্বন্দ্বে হঠাৎ আরও একটি পক্ষ দাবীদার হয়ে যোগদান করে,—ক্ষুদ্র হলেও তা তীক্ষ্ণ মুখ কাঁটার মত বিদ্ধ করার জ্বালা নিয়ে জেগে ওঠে। সিকিমে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভুটিয়া-লেপচা গোষ্ঠীকে সর্বদা এক তন্ত্রীতে গাঁথার চেষ্টা করা হলেও তার মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম ফাঁক ছিল তা একবার প্রকাশিত হয়েছিল চাঙ-জোৎ বো-লোতের হত্যাকাণ্ডের পর লেপচা বিদ্রোহের মধ্যে। দীর্ঘকাল পরে আবার সেই ফাঁকটি হঠাৎ প্রকট হয়ে ওঠে। শ্রীমতী রুথ কারথক নামে একজন লেপচা মহিলা লেপচাদের নিয়ে এই সময় একটি আলাদা দল গঠন করেন এবং চো-গিয়াল তথা ভুটিয়া রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর দলের বক্তব্য হল যে সিকিমের আদি অধিবাসী লেপচা জাতি ভুটিয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে চিরদিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িত ও শোষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু সিকিমের আদি অধিবাসী হিসেবে লেপচাদেরই একমাত্র রাজা হওয়ার অধিকার রয়েছে। ইনি 'লেপচা রাণী' নামে নিজেকে প্রচার করতে থাকেন। 1967 সালের নির্বাচনের সময় রুথ কারথক 'সিকিম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি' নাম দিয়ে 6 জন লেপচা প্রার্থীকে দাঁড় করানর জন্য মনোনয়ন পত্রও পেশ করেছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে নির্বাচন কমিটি সেই মনোনয়ন পত্রগুলি বাতিল করে দেয়। ফলে রুথ কারথক আরও-উগ্রভাবে চো-গিয়াল বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন এবং লেপচাদের নিয়ে বিদ্রোহ করার জন্য আয়োজন করতে থাকেন।

রুথ কারথকের এই আকস্মিক উদ্ভবের পিছনেও অন্য বিদেশী কোন গোপন শক্তির হাত ছিল বলে সন্দেহের কারণ আছে। তাছাড়া এই লেপচা দুহিতা এ. হালিম নামে একজন ভারতীয় মুসলমানকে বিবাহ করায় তার সম্বন্ধে সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়।

সুতরাং শ্রীমতী রূথ কারথক ও তার স্বামী দুজনকেই সিকিমের নিরাপত্তা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করে বন্দী করা হয়। অবশ্য পরে তার স্বামী হালিমকে মুক্তি দেওয়া হলেও ভবিষ্যতে তার সিকিমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সরকারী আদেশ ঘোষণা করা হয়। এরপর অন্য একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হয় যে, সিকিমের কোন মহিলা যদি কোন অসিকিমী ব্যক্তিকে বিবাহ করে তবে তার সিকিমের নাগরিকত্ব বাতিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে রূথ কারথকের সিকিমের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। কিন্তু তারপরও রূথ কারথককে মুক্তি দেওয়া হল না। এবার রূথ কারথক আরও এক নাটকীয় ঘটনা ঘটালেন, তিনি একদিন জেল থেকে পালিয়ে গেলেন আশ্চর্য উপায়ে। পলাতকা রূথ কারথক, সম্ভবত নিজেকে ভারতের নাগরিক মনে করে, ভারতীয় নিবাসে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় সচিব এই ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করেন এবং তাকে সিকিম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। সিকিমের আদালতে রূথ কারথকের বিচার হয়। রাজদ্রোহ, বিদ্রোহের প্ররোচনা দেওয়া ও জেল থেকে পালানোর অপরাধে আদালত তাকে দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দান করে (15ই নভেম্বর, 1968)। কিন্তু সিকিম সরকার কয়েক মাস পরে রূথ কারথককে মুক্তি দিয়ে, যেহেতু তার সিকিমের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে গিয়েছিল এবং তার আচরণ সিকিমের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল সেজন্য সিকিম থেকে তাকে নির্বাসনের আদেশ দান করে। বাধ্য হয়ে রূথ কারথককে সিকিম ছেড়ে চলে আসতে হয়। ক্ষণস্থায়ী হলেও শ্রীমতী রূথ কারথকের এই আন্দোলন সিকিমের আরেকটি নূতন তথ্যের উপর আলোকপাত করতে সমর্থ হয়,—তা বিগত তিনশত বছর ধরে ভুটিয়া প্রভুত্ব মেনে নিলেও এই নম্র শান্ত নিরীহ লেপচা সম্প্রদায়ের বুকের ভিতর এক চাপা ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল চিরদিন।

ভারত-বিদ্বেষ এবং ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি, দ্বিধা-বিভক্ত আন্দোলন

সিকিমের চতুর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1970 সালে। এই নির্বাচনে 1967 সালের পদ্ধতিতেই আসন বন্টন করা হয় এবং আসন সংখ্যাও একই রাখা হয়। নির্বাচনের ফলেও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। এর অন্যতম কারণ, সিকিমের গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে কোন সংহতি ছিল না, সাংগঠনিক দৃঢ়তারও ছিল একান্ত অভাব। তাছাড়া রাজরোষের বলি হয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ হানির ভয় দলের অনেক নেতাকে দুর্বল করে রেখেছিল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থও দলগুলির

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে প্রধান বাধা হয়ে উঠেছিল। তাই বিরোধী দল বলতে যা বোঝায়, সত্তরের দশক পর্যন্ত সিকিমে তেমন কোন শক্তিশালী দল গড়ে ওঠে নি। এ বিষয়ে সেদিনের *Himalayan Observer* পত্রিকা যে মন্তব্য করেছিল তা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না ঃ "In Sikkim the very word 'opposition' carries an opprobrium, and to be identified as the 'opposition' is to incur the perpetual wrath of the Sikkim Durbar and face continual persecution at the hands of major and minor officials"—(7 March, 1970).

বিরোধী নেতাদের অধিকাংশেরই তখন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের চেয়ে রাজ্য পরিষদে নির্বাচিত হয়ে সদস্যপদ লাভ করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। কারণ, এর দ্বারা ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের আকর্ষণ অনেক বেশী কাম্য ছিল। অন্যদিকে ভারত-বিরোধী মনোভাব যে কতটা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় সম্যক ভাবে ফুটে উঠলো 1973 সালে, সিকিমের পঞ্চম নির্বাচনে, চো-গিয়ালপন্থী সিকিম ন্যাশনাল পার্টির বিপুল জয়ে। এতে মোট আঠারটি নির্বাচিত আসনের মধ্যে সিকিম ন্যাশনাল পার্টি পায় এগারটি আসন, ন্যাশনাল কংগ্রেস পাঁচটি এবং জনতা কংগ্রেস দুটি। চো-গিয়াল পল-দেন-থন-দুপ এবার অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলেন।

চো-গিয়াল পল-দেন-থন-দুপ এবং তার অনুগতদের মধ্যে ভারত-বিরোধী ভাব এত তীব্র হয়ে উঠেছিল কেন, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ভারত সরকারের প্রতি তাদের এই ক্ষোভের বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল। এ বিষয়ে সিকিমের প্রাক্তন মুখ্য সচিব ইয়াপা দাদুল এবং অন্যান্য প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছে যে অভিমত পাওয়া যায়, যুক্তি হিসেবে তা হয়তো একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমতঃ (ক) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সিকিমের উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। সিকিমের বহু উচ্চাভিলাষী শিক্ষার্থী ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিদেশে শিক্ষা লাভ করার জন্য আগ্রহী হলেও তাদের সে সুযোগ দেওয়া হয় নি। চো-গিয়াল নিজেও এ বিষয়ে আবেদন করে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোন আশার ইঙ্গিত পান নি। সিকিমের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এ নিয়ে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। (খ) সিকিমে বিদেশী পর্যটকদের ক্ষেত্রে ভারত সরকার আরোপিত নিয়ন্ত্রণ থাকায় বিশেষ অনুমতি ছাড়া বিদেশী পর্যটকরা ভ্রমণের সুযোগ পেতেন না। অথচ দার্জিলিং বা কাশ্মীরে তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা

হয় নি। এরফলে সিকিমে পর্যটন উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও সিকিম এক বড় আর্থিক লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এ বিষয়েও ভারত সরকার চো-গিয়ালের আবেদন বার বার অগ্রাহ্য করে। (গ) সিকিমে উৎপন্ন শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য সরাসরি বিদেশে রপ্তানী করার অনুমতি চেয়েও চো-গিয়াল ব্যর্থ হন। অথচ সিকিমের কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য, বিশেষ করে কার্পেটের, বিদেশের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা ছিল। এ ব্যাপারেও সিকিমের অধিবাসীদের মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। (ঘ) সিকিমের প্রত্যেক মহারাজা এবং বহু উচ্চবিত্ত কাজীদের তিব্বতে ও পাশ্ববর্তী এলাকায় জমি ও সম্পত্তি ছিল। চীন-ভারত সংঘর্ষের পরে সীমান্ত দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে সেগুলি রাজপরিবার ও অন্যান্য মালিকদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এ জন্য চো-গিয়াল চেয়েছিলেন অন্ততঃ চুম্বী ও গোপ্তায় তাদের যে জমিগুলি রয়েছে সেগুলি দেখাশোনা করার জন্য তার কয়েকজন প্রজাকে সিকিম ও চুম্বীর মধ্যে যাতায়াত করার অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সে অনুমতি দেওয়া সম্ভব হয় নি। এরফলে রাজপরিবারের ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কম হয় নি। (ঙ) 1970 সালে নেপাল থেকে যুবরাজ বীরেন্দ্রর বিবাহ অনুষ্ঠানে চো-গিয়ালকেও যথারীতি আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তিনি সানন্দে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে পরে তাঁকে জানানো হল যে ঐ অনুষ্ঠানে তাঁকে রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদা না দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নেপালের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এ বিষয়ে লেখে যে ভারত সরকারের নির্দেশেই চো-গিয়ালকে রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদা না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই চো-গিয়াল ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে তাঁর কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য নেপালে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই ঘটনা তাঁকে অত্যন্ত আহত ও ক্ষুব্ধ করে। এই হতাশা, বেদনা ও ক্ষোভ থেকেই ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের জন্ম এ অনুমান হয়তো একেবারে অসঙ্গত নয়। যা একদিন ক্ষুদ্র বীজ ছিল তাই একদিন মহীরূহ হয়ে ওঠে। সিকিমের চিন্তাশীল কিছু কিছু প্রাচীন ব্যক্তি আজও এই অভিমত পোষণ করেন যে, চো-গিয়াল পল-দেন-থন-ডুপ ও ভারত সরকারের মধ্যে মনোমালিন্যের জন্য দায়ী একদিকে ভারতের সেই সময়কার কয়েকজন সচিব ও সরকারী কর্মচারী এবং অন্যদিকে চো-গিয়ালের কিছু কূট পরামর্শদাতা। আর যে বিদেশিনী গূঢ় কার্যসিদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে, লালন করে মহীরূহ করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আজ স্বীকৃত সত্য। আর সেই ভূমিকা শেষ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 1973 সালে তিনি আমেরিকাতে ফিরে যান এবং আর কখনই সিকিমে পদার্পণ করেন নি। পরে যখন গ্যাল-মো থাকার শেষ আশাটুকুও মুছে গেল, আমেরিকার আদালত থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় আদায় করে তিনি ধরা ছোঁয়ার উর্দ্ধে নিজেকে গোপন করে ফেললেন।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। 1973 সালের নির্বাচনে সিকিম ন্যাশনাল পার্টির আশাতিরিক্ত জয় অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল। সিকিম রাজ্য কংগ্রেস, ন্যাশনাল কংগ্রেস ও জনতা কংগ্রেস তখন কাজী লেন-দুপ দোর্জের নেতৃত্বে 'সিকিম জনতা কংগ্রেস' নামের পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং সমবেত আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 4 এপ্রিল, 1973—চো গিয়াল পল-দেন-থন-দুপের 50তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেদিন সকালে চো-গিয়ালের দীর্ঘ জীবন, সুখ ও সমৃদ্ধির কামনায় যখন বিভিন্ন গোম্পায় প্রার্থনা অনুষ্ঠান চলছিল, ঠিক তখনই বিশাল জনতার এক উত্তাল মিছিল বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গ্যাংটকের রাস্তায়। সিকিম রক্ষীবাহিনী এসে পথ আটকালো সঙ্গীন উঁচিয়ে, কিন্তু জনতা এবার ভয় পেয়ে পিছু হটে গেল না, বাঁধ ভাঙ্গা বিক্ষোভ ক্রমে বিপ্লবের রূপ নিতে শুরু করল। ফলে সিকিমের রাস্তায় চলল পুলিশের গুলি, ঘটে গেল কয়েকটি হতাহতের ঘটনা। অন্যদিকে চো-গিয়ালপন্থী ন্যাশনাল পার্টির সভাপতি নিহত হলেন বিক্ষোভকারীদের হাতে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য জেলা সদরগুলিতেও। চো-গিয়াল ভারতীয় পলিটিক্যাল অফিসারের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী টহল দিতে শুরু করলো সিকিমের রাস্তায় রাস্তায়। 9 এপ্রিল ভারত সরকার শ্রী বি. এস. দাসকে চীফ একজিকিউটিভ হিসেবে সিকিমে পাঠান। তিনি শাসন পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব হাতে নিয়ে অবস্থা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন।

ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির পটভূমিকা

8 মে চো-গিয়ালের প্রাসাদে একটি সর্ব দলীয় বৈঠক আহ্বান করা হল। সেখানে চো-গিয়াল, বি. এস. দাস ও অন্যান্য দলীয় নেতাদের উপস্থিতিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়,—(ক) পূর্ণ গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, (খ) গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন, (গ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, (ঘ) জনগণের মৌলিক অধিকারের ঘোষণা, (ঙ) স্বাধীন বিচার-বিভাগ স্থাপন এবং (চ) নির্বাচিত আইন সভার হাতে অধিক ক্ষমতা দান। এ ছাড়া চুক্তিতে, চার

বছর অন্তর নির্বাচন এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে 'এক জন এক ভোট' পদ্ধতি গ্রহণ করার কথাও উল্লেখ করা হয়। এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবর্তী সময়ের জন্য একটি পরিষদ গঠন করা হয় এবং সিকিম ন্যাশনাল পার্টি, সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস ও সিকিম জনতা কংগ্রেস, এই তিন দল থেকে 5জন করে সদস্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এর পরেই সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস ও সিকিম জনতা কংগ্রেসের সদস্যরা মিলিত হয়ে 'জনতা কংগ্রেস' নামে পরিচিত হয়। ফলে নব গঠিত এই পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা হওয়ায় তাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিবাদ স্বরূপ সিকিম ন্যাশনাল পার্টি পরিষদ বর্জন করে। 1973 সালের শেষ পর্যন্ত চীফ একজিকিউটিভ হিসেবে বি. এস. দাসই একচ্ছত্রভাবে সিকিমের শাসন পরিচালনা করেন। এ জন্য চো-গিয়াল তাঁকে ব্যঙ্গ করে 'নয়া চো-গিয়াল' বলে উল্লেখ করতেন। তবু চো-গিয়াল কখনও তাঁর বিরোধিতা করেন নি।

'মে চুক্তি' অনুসারে নূতন নির্বাচন ও সরকার গঠন ত্বরান্বিত করা সব দলেরই একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছিল। 1974 সালের এপ্রিল মাসে নির্বাচনের সময় ধার্য করা হয়। জনতা কংগ্রেস ভোটার তালিকা সংশোধন ও একজন ভারতীয় নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করার দাবী জানায়। শ্রী রথীন সেনগুপ্ত এই দুরূহ জটিল নির্বাচন যজ্ঞ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হয়ে এলেন। আসন সংখ্যা এবং আসন বন্টন নিয়ে আবার তীব্র মতভেদ শুরু হল। দীর্ঘ বাদানুবাদের পর আসন বন্টনের ব্যাপারে একটি আপোষ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। আসন সংখ্যা স্থির হয় মোট 32টি,—15টি ভুটিয়া-লেপচা গোষ্ঠীর, 15টি নেপালী গোষ্ঠীর, একটি সঙ্ঘ বা গোম্পার ও একটি তপশিলী জাতির জন্য ধার্য হয়। আগের নির্বাচন এলাকাগুলিকেও বিভক্ত করে জাতি-ভিত্তিক কয়েকটি উপ-এলাকা গঠন করা হয়।

কিন্তু এই নির্বাচনের সময় চো-গিয়ালের নিয়তিই সম্ভবত তাঁকে আবার এক দুর্ভাগ্যের পথে নিয়ে গেল, তিনি আবার এক বিরাট ভুল করলেন। এতদিন সিকিম ন্যাশনাল পার্টি চো-গিয়ালপন্থী দল হিসেবেই সিকিমের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে এসেছিল। এবার চো-গিয়াল ঐ দলের কয়েকজন নেতা ও সদস্যের উপর আস্থা হারিয়ে 'পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি' নাম দিয়ে এক নতুন দল গঠন করলেন। ফলে সিকিম ন্যাশনাল পার্টির বহু সদস্য মর্মাহত হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না-করার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে এই নতুন দলের সদস্যরা যে রাজনীতি ও নির্বাচনেই শুধু অনভিজ্ঞ ছিল তাই নয়, দলের মধ্যে কয়েকজন নেপালী সদস্যকে গ্রহণ করার ফলে

গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন করার সময়ই প্রকট হয়ে উঠলো। তবুও এই নতুন দল—'পিপিলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'—সব কয়টি আসনেই প্রার্থী দেয়।

জনতা কংগ্রেস দলের নেতা হলেন কাজী লেন-দুপ দোর্জে, 'কাজী সাহেব' নামেই যার সমধিক পরিচিতি। দলের আসল পরিচালিকা হলেন 'কাজিনী' যিনি চো-গিয়াল পদের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতার অধীশ্বরী হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন বহুদিন থেকে। 1974 সালের নির্বাচন, প্রকৃতপক্ষে, কাজী লেন-দুপ দোর্জে বনাম চো-গিয়াল পল-দেন-থন-দুপ, এই দুজনের শক্তি পরীক্ষার দ্বন্দ্ব হয়ে উঠলো, অথবা বলা যায়, গণতন্ত্র বনাম রাজতন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা। নির্বাচনের ফল ঘোষিত হলে দেখা গেল, 32টি আসনের 31টিতেই জয়লাভ করেছে কাজী সাহেবের জনতা কংগ্রেস, 32তম আসনটি ছিল ন্যাশনাল পার্টির। চো-গিয়াল পল-দেন-থন-দুপ রাজকীয় ভঙ্গিতেই এই পরাজয় বরণ করে নিলেন কাজী সাহেব সহ সমস্ত নির্বাচিত প্রার্থীকে রাজ-প্রাসাদের সান্ধ্যভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে। তাঁর নিজেরই একটি উক্তি সেদিন রাজ-প্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে যেন অশ্রুত এক প্রতিধ্বনির মত আঘাত করে ফিরছিল, 'My days are numbercd but Sikkim will remain for ever.'

নবগঠিত আইন সভার নেতা হলেন কাজী লেন-দুপ দোর্জে, এবং বি. এস. দাস হলেন অধ্যক্ষ। আইন পরিষদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল সিকিমের জন্য একটি লিখিত সংবিধান প্রণয়ন এবং চো-গিয়াল ও নির্বাচিত আইন পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বৈধ বণ্টন। এ বিষয়ে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রাক্তন আইন সচিব সি. আর. রাজগোপালনকে সিকিমে পাঠানো হয়। সিকিম সরকারী আইনের খসড়া প্রস্তুত হলো এবং 27 জুন (1974) তারিখে আইন সভায় তা পাস করার জন্য ধার্য হল। বলা বাহুল্য, এই আইনে চো-গিয়ালকে 'নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান'-এর মর্যাদা দিয়ে সমস্ত ক্ষমতাই সীমিত করা হয়। 27 জুন আইন পাস হওয়ার আগেই সিকিম পরিষদ ভবনের সামনে, সিকিম ন্যাশনাল পার্টির সদস্য ও চো-গিয়ালপন্থী জনসাধারণ বিরাট মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং সংবিধান বিলের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে থাকে ও পরিষদ ভবনের পথ অবরোধ করে সদস্যদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। অবশেষে ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়। এজন্য বিল পাশ করাও সেদিন সম্ভব হল না, পরদিন 28 জুন সর্বসম্মতিক্রমে তা পাশ হয়। চো-গিয়াল নিজেও ঐ বিলে প্রথমে স্বাক্ষর করতে সম্মত হন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মেনে নিতেই

হয়। 4 জুলাই নিজের ক্ষমতা-হরণের আইনে নিজেই স্বাক্ষর করলেন ধর্মরাজা পল-দেন-থন-দুপ নাম-গিয়াল।

গভর্ণমেণ্ট অফ সিকিম এ্যাকট, 1974-এর 30-তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে সিকিমের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য সিকিম সরকার ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা সংসদে প্রতিনিধিত্ব বা অংশ গ্রহণ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই মর্মে উক্ত আইন পাশ হওয়ার পর সিকিম আইন পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে ভারতীয় সংসদের লোকসভা ও রাজ্য সভায় অংশ নিতে বা সিকিমের জনগণের প্রতিনিধিত্ব লাভ করার জন্য তারা আগ্রহী। সিকিম পরিষদের এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানের 35তম সংশোধন দ্বারা সিকিমকে ভারতের অঙ্গ রাজ্যের স্বীকৃতি দান করা হয় (সেপ্টেম্বর, 1974 এবং মার্চ, 1975 থেকে আইনটি কার্যকরী করা হয়)। এতে ভারতীয় সংসদের লোকসভাতে সিকিমের একজন প্রতিনিধির (জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত) এবং রাজ্যসভাতে একজন প্রতিনিধির (পরিষদের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত) দুটি আসন সংযুক্ত করা হয়।

সিকিমের সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনসাধারণ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতের এই সংবিধান সংশোধন বিলকে স্বাগত জানাচ্ছিল, ঠিক তখনই অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু আঁকড়ে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছিলেন চো-গিয়াল পল-দেন-থন-দুপ কালের বিপরীত দিকে উজান বেয়ে। 1975 সালের মার্চ মাসে নেপালের রাজা যুবরাজ বীরেন্দ্রর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে তিনি সিকিমের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যোগ-দান করেন! সেই অনুষ্ঠানে তিনি আমেরিকা চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সিকিম পরিস্থিতি ও ভারত সরকারের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সিকিম পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক সমস্যারূপে রাষ্ট্রসঙ্ঘে উত্থাপন করার প্রস্তাব করেন। শোনা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ না পেলেও চীন ও পাকিস্তান তাঁকে এ বিষয়ে যথেষ্ট আশ্বাস দান করে। এই আলোচনার কথা নেপালের কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিকিমের আইন পরিষদে ও রাজনৈতিক মহলে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী কাজী লেন-দুপ দোর্জে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তাঁর মন্ত্রী পরিষদের পক্ষ থেকে এক পত্রে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে চো-গিয়াল পল-দেন-থন-দুপের আচরণ ভারত ও সিকিম উভয় দেশের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সুতরাং এই মুহূর্তে তাঁর চো-গিয়াল পদের অবসান করা হোক।

চো-গিয়ালের বিরুদ্ধে মন্ত্রী পরিষদের আরও একটি অভিযোগ তীব্র আকার ধারণ করে। 1969-74 সাল পর্যন্ত ভারত সরকার সিকিমের উন্নয়নের জন্য প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা দান করেছিল, কিন্তু সেই অর্থ চো-গিয়াল তার নিজের ব্যাঙ্ক আমানতে জমা রেখেছিলেন। কাজী লেন-ডুপ দোর্জে একে সরকারী অর্থের অপব্যবহারের অপরাধ বলে বিবৃতি দান করেন এবং সমস্ত অর্থ ফেরত দেবার জন্য চো-গিয়ালের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হয়। এর মধ্যেই চীফ একজিকিউটিভ পদে বি. এস. দাসের জায়গায় এলেন শ্রী বি. বি. লাল। ইনি দেরাদুনে চো-গিয়াল পল-দেন-থন-ডুপের সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু সতীর্থের প্রতি এই অর্থ অপব্যবহারের ব্যাপারে কোন সহানুভূতি দেখালেন না বি. বি. লাল, বরং ঐ অর্থের পরিষ্কার হিসাব দাখিল করার জন্য নির্দেশ পাঠালেন। এই নিয়ে উভয়পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ যতই তীব্র হতে থাকে 'চো-গিয়াল' উৎখাতের দাবীও ততই উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আইন সভার এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হয় (10 এপ্রিল, 1975)। সেই অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল : 'The Institution of Chogyal is hereby abolished and Sikkim Shall henceforth be a constituent unit of India.'

এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ জনসমর্থনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে 14 এপ্রিল এক বিশেষ 'গণভোট'-এর ব্যবস্থা করা হয়। এই গণভোটে সর্বমোট 97,000 নির্বাচকের মধ্যে চো-গিয়ালের সপক্ষে মাত্র 1,496 ভোট এবং বিপক্ষে 59,637 ভোট পড়ে। সিকিমের তিনশ বছরের একক রাজতন্ত্র ঐ গণভোটের রায় অনুসারে এবার বহুজনের গণতন্ত্রকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

সিকিমে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার মুখপাত্র আইন পরিষদে 'চো-গিয়াল' উচ্ছেদের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন ভারতের সংসদেও 38তম সংবিধান সংশোধন বিলের উপর সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে তুমুল বিতর্কের তুফান বয়ে চলেছিল। অবশেষে ভারতীয় সংবিধানের 36তম সংশোধন আইন পাশ হল এবং সংবিধানের 371 এফ অনুচ্ছেদ অনুসারে সিকিম ভারতবর্ষের 22তম রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়ে ভারতের মানচিত্রে স্থান অর্জন করতে সমর্থ হলো (26 এপ্রিল 1975)। এই আইন কার্যকর করা হয় 16 মে থেকে। সিকিমের নূতন জন্মলগ্নে রজত গিরি খাঙ-চে-জো-ঙ্গা দেবতা এবার শুধু নাম-গিয়াল পরিবার নয়, সমস্ত সিকিমবাসীর অভিভাবক দেবতা হয়ে প্রসন্ন উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। □

এক নজরে সিকিম

রাজধানী : গ্যাংটক (উচ্চতা : 5,800 ফুট)
জনসংখ্যা : 315,000 (1981)
আয়তন : 2818 বর্গ মাইল

জেলা : 4 (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম) ; জেলা সদর : মঙ্গণ, নামচি, গ্যাংটক, গেজিং ; পঞ্চায়েত : 215 ; বিধানসভার আসন সংখ্যা : 32, সংসদের আসন সংখ্যা : 2 (লোকসভা ও রাজ্য সভায় একটি করে) ;

স্বাক্ষরতা : 32% ; বিদ্যালয় : 504 (সরকারী) : কলেজ : 2 (সরকারী, একটি আইন কলেজ) : কৃষি গবেষণা কেন্দ্র : 1 ; ভোট বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান : 1 ; নালন্দা বৌদ্ধ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র : 1

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র : 58 ; হাসপাতাল : 5

শিল্প সংস্থা : 5, ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা : 50 ; গ্রামীন শিল্প সংস্থা : 9 ; চা বাগিচা : 2 ; প্রধান কৃষিজাত ফসল : বড় এলাচ, ধান, ভুট্টা, আলু, কমলালেবু, স্কোয়াশ। □

কয়েকটি চলতি শব্দের অর্থ

তিব্বতী

উচ্চারণ	*অর্থ*
চো-গিয়াল (ছো-গ্যাল)	ধর্মরাজা
ডেঞ্জোঙ	সিকিম
বেয়ুল ডেমোজোঙ (ডেমোশোঙ)	গুপ্তভূমি। ধান্য দেশ (সিকিমের নাম)
খাঙ-চেন-জো-ঙা (খাঙ-চে-জো-ঙ্গা)	হিমবৎ পঞ্চকোষ (কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত)
ছাঙ	গৃহে প্রস্তুত মদ বা সুরা।
ছুবা	তিব্বতী মহিলাদের আলখাল্লা জাতীয় ঢিলে পোষাক।
টাশী-লামা (তাসী-লামা)	পাঞ্চেন লামার মঠের নাম টাশী ল্হুনপো, সেই মঠের লামাকে বলা হয়। অবশ্য যে কোন শুভ কাজে এই মঙ্গলদায়ক লামাকে দিয়ে পূজা করান রীতি। টাসী-ল্হুন-পো=মঙ্গলকূট।
আ-মা	মা।
গোম্পা	মঠ, বিবিক্ত স্থান।
কা-দাম-পা	মৌলিক বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটক অনুগমনে প্রতিষ্ঠিত, অতীশ দীপঙ্কর প্রবর্তিত তিব্বতী বৌদ্ধ সম্প্রদায়। অতীশের শিষ্য ডোম-তন কর্তৃক পরিসৃষ্ট।
বোন-বোন ফোন	প্রাক-বৌদ্ধ তিব্বতী ধর্ম-সম্প্রদায়।
নাম-গিয়াল (নামগ্যাল)	বিজয়। সিকিম রাজবংশের উপাধি।

উচ্চারণ	*অর্থ*
লামা	অনুত্তর, সর্বশ্রেষ্ঠ, তিব্বতী বৌদ্ধ ভিক্ষু (পুরোহিত)।
লো-সুঙ	সিকিমী নববর্ষ।
পাঙ-ল্হাব-সোল	শ্যামল ভূমি দেবতার পূজা। সিকিমীদের এই উৎসব আগামী বছরের শুভ কামনায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেবতার (সিকিমের আরক্ষক দেবতা) পূজা।
গ্যাল-পো	রাজা।
গ্যাল-মো	রানী।
জোঙা	সিকিমের রক্ষক যক্ষরাজ।
সাগা-দাওয়া	বৈশাখী পূর্ণিমা। বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মৃত্যু দিনের উৎসব উদ্‌যাপন।
থাঙকা (থাঙ-গা)	ধর্ম্মীয় পটচিত্র।
ফ্রু থাঙ (শান-থাঙ)	ঐ (সম্মান সূচক)।
থুচে	(দয়ালু) ধন্যবাদ।
থুজেছে	(মহাকারুণিক) ধন্যবাদ।
জোঙ	বৃহৎ উপত্যকা, জেলা বা প্রদেশ।
জোঙ-পন	জেলা শাসক।
চাঙ-জোৎ (ছাঞ্জোদ্)	কোষাধক্ষ্য বা মন্ত্রী।
দো-নীয়ার (থোন্-এ্রের)	দেওয়ান, মঠের পূজারী বা যিনি মন্দিরের কাজ কর্ম দেখাশোনা করেন।
থুঙ-ইক (ঠুঙ-ষিক)	কেরাণী, সচিব।
দিঙ-পোন্	সেনাধ্যক্ষ, রক্ষী বাহিনীর প্রধান।
ছোঙ দু (চোঙ-দু)	সভা, সংসদ।
লাচুং-পা (লাছুঙ-পা)	ক্ষুদ্র গিরিপথের অধিবাসী। উত্তর সিকিমের লাচুং উপত্যকার অধিবাসীদের বলা হয়। পা=লোক।
লাচেন-পা (লাছেন-পা)	বৃহৎ গিরিপথের অধিবাসী। উত্তর সিকিমের লাচেন উপত্যকার অধিবাসী।

উচ্চারণ	*অর্থ*
লাদে মিদে	লামাদের প্রশাসন, মঠ, স্তুপ প্রভৃতি ধর্ম্মীয় স্থানের পরিচালন ও প্রশাসন ব্যবস্থা। তিব্বতে ও সিকিমে যে লামারা শাসন কাজে অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে বলা হয়।
লা	গিরিবর্ত্ম, গিরিপথ।
সাচু (ৎছাছু)	উষ্ণ প্রস্রবণ।
ডিমো	চমরী গাই, ইয়াক।
জো-বো-গুরু রিম-পোচে	প্রভু মহারত্ন। গুরু পদ্মসম্ভবের প্রচলিত নাম।
লাচেন-চেমবো	মহান দেব। সিকিম রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা লামার নাম।
নাদাক-সেমপা-ছেন-পো	প্রভু মহাসত্ত্ব। সিকিম রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা অপর লামার নাম।
দালাই লামা (তালই লামা)	সাগরের মত বিশাল। মঙ্গোল সম্রাট আল্‌তান খাগান তিব্বতের তৃতীয় দালাই লামাকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে এই উপাধিই প্রচলিত হয়।
ফুন্তসো (ফুন-ৎছো)	ত্রিসম্পাদ বিজয়ী। সিকিমের প্রথম রাজার নাম।
জিগমে-পাও	অভয় বীর। ইনি প্রধান লামা হিসেবে তিব্বত থেকে সিকিমে এসেছিলেন।
নাম-গিয়াল (নাম-গ্যে)	বিজয়। লামা লাচেন চেমবোর নাম। পরবর্তীকালে সিকিমের রাজবংশের পদবী বা নামের শেষে ব্যবহৃত হতো।
সোনাম-শেরিং (সোনাম-ৎছেরিং)	পুণ্য, দীর্ঘায়ুস। সিকিমের রাজনৈতিক নেতা ও বিধানসভার অধক্ষ্য ছিলেন।
তাসী-শেরিং (টাশী-ৎছেরিং)	মঙ্গল দীর্ঘায়ুস। সিকিমের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন।

উচ্চারণ	*অর্থ*
লেন-দ্রুপ-দোর্জে (লেহ্‌ন-ড্রুপ-দোর্জে)	আভোগসিদ্ধ বজ্র। সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নাম।
গ্যাংটক (গান্তোক)	পর্বত শীর্ষ। সিকিমের রাজধানী।
নামচি (নামৎচে)	আকাশ চূড়া। সিকিমের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জেলা সদর।
গেজিং (গ্যাল-শিঙ)	রাজক্ষেত্র। পূর্ব সিকিমের জেলা সদর।
জেলেপ-লা	মসৃণ, সমতল। গিরিপথের নাম।
নাথু-লা (নাথো লা)	কর্ণগোচর। গিরিপথের নাম।
রাব-দেন-শে (রাব-দেন-ৎচে)	উচ্চ বরাসন। পশ্চিম সিকিমে অবস্থিত প্রথম রাজধানী।
দোর্জে-লিঙ (দোর্জে-লিং)	বজ্রদ্বীপ। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার একটি জেলা (দার্জিলিং)। দার্জিলিং তিব্বতী দোর্জেলিঙ শব্দের ইংরাজী উচ্চারণ।
ইয়ুম থাঙ	মাতৃ উপত্যকা। উত্তর সিকিমে অবস্থিত।
তুগ্‌-লা-খাঙ (ৎসুগ-লা-খাঙ)	আভোগসিদ্ধ বিহার। সিকিমের রাজ-প্রাসাদ সংলগ্ন দেবালয়।

লেপচা

লেপচা ও তিব্বতী শব্দের সংমিশ্রণে বর্তমান সিকিমী ভাষার উৎপত্তি। লেপচা ভাষার মধ্যেও অনেক তিব্বতী উদ্ভব শব্দ রয়েছে। এখানে সেই ধরণের শব্দগুলির অর্থ দেওয়া হল।

উচ্চারণ	*অর্থ*
জো-খ্যে-বুমসা	লক্ষ মল্লবিজয়ী। সিকিমে প্রথম যে তিব্বতী ব্যক্তিটি আসেন, তাঁর অতুল শক্তি দেখে এই নাম দেওয়া হয়েছিল।

উচ্চারণ	*অর্থ*
লঙ-মো-রাব	কৃষক বা যে জমির উপর জীবিকা নির্বাহ করে। খ্যা-বুমসার পুত্রের নাম।
মি-পোন-রাব	জননেতা, শাসক। খ্যা-বুমসার তৃতীয় পুত্রের নাম।
কার-ওয়াং	কোষাধক্ষ্য, নটেশ্বর, রাজ কর্মচারী।
পিপ্পন (পিপোন)	মণ্ডল, গ্রামের প্রধান।
মেনি-রী	তিব্বতীরা নীচু দেশের অধিবাসী লেপচাদের নাম দেয়।
রঙ বা রোঙ (রুঙ-পা)	জল। লেপচা জাতিরা নিজেদের বলে। দাঁড়কাক সম্প্রদায়।
রোঙ-ঞ্যু	সোজা পথে বয়ে যাওয়া নদী। তিস্তা নদীর লেপচা নাম।
রোঙ-ত্রিৎ	যে নদী ঘোরান পথে বয়ে যায়। রঙ্গীত নদীর লেপচা নাম।
বুন-থিঙ (বোঙ-থিঙ)	ইৎমো নামে লেপচা দেবীর পুত্র। লেপচাদের পুরোহিত এবং প্রাণী জগত ও দেবলোকের মধ্যে সংযোগ কর্তা।
কারথক্	লেপচা জাতের সংজ্ঞা, সেনাপতি।
পুনু (পানো)	রাজা। লেপচাদের প্রথমে রাজা ছিল।
থারা	লেপচা পুরুষের পোষাক।

নেপালী

উচ্চারণ	*অর্থ*
দাজু	বড় ভাই।
বৈনি	ছোট বোন।

উচ্চারণ	অর্থ
দাওরা সুরুয়াল	নেপালী পুরুষের পোষাক—কোট ও চুরিদার পাজামা।
গোর্খালি	নেপালীদের যোদ্ধা জাতিকে গোর্খা বলা হয়। নেপালীরা এখন নিজেদের গোর্খালি বলে।
কাজী	শাসক বা রাজ্যপাল। সামন্ত প্রভুদের 'কাজী' নামে অভিহিত করা হয়। এরা এক একটি অঞ্চলের শাসক এবং বিচারক ছিলেন।
দঁশই (দসেঁই)	আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশম তিথিতে এই উৎসব শুরু হয় (দুর্গোৎসব)। প্রথম তিন তিথিও এই উৎসবের অন্তর্গত। এই তিন দিনের পৃথক নাম : সপ্তমী=ফুলপাতি অষ্টমী=ব্রত নবমী (নৌমী)=মার দশমী (দসৈঁ)=টিকা
ভাইটিকা	বিজয়া দশমীর দিন কপালে চাল চন্দন ও সিন্দুরের টীকা দেওয়ার অনুষ্ঠান। শেষ হয় ভাইফোঁটার দিন।
দেউসি (দেওসুরে)	দীপাবলির পঞ্চম দিন এই অনুষ্ঠান হয়। প্রাচীনকালে শ্রীরামের চরিত্র বর্ণনাই এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বারাণসীতে "দেব আসিক" দোলের সময় বলার প্রথা আছে।
তিহার	উৎসব, পূজা অনুষ্ঠান।
পাথি	তাম্র নির্মিত ওজনের পাত্র। এক পাথির ওজন—5 কিলো সমান।

উচ্চারণ	*অর্থ*
বাক্কু (বক্খু)	তিব্বতী মহিলাদের লম্বা আলখাল্লার মত পোষাক—তিব্বতীতে বলা হয় "ছুবা"।
জাঁড়	ভাত বা চাল থেকে ঘরে তৈরী মদ। নেপালী ভাষায় মদকে "রক্সি"ও বলে। জাঁড় তিব্বতী "ছাঙ" নামে মদকে বলা হয়।
কোদো	মারোয়া জাতীয় শষ্যকণা। এর থেকে মদ প্রস্তুত করা হয় ও মিহি গুঁড়ো করে রুটি বা অন্য খাদ্যও তৈরী হয়।
ইসকুস (স্কোয়াশ)	ইংরেজী শব্দ Squash-এর অপভ্রংশ বলে মনে হয়। পাহাড় অঞ্চলের একধরনের সব্জি।
লাপচো (লাপচা)	নেপালী ভাষায় রোঙ বা লেপচা জাতিদের বলা হয়।
বিজুয়া	ওঝা। এরা রোগ ব্যাধি ইত্যাদির সময় ঝারফুঁক করে।

□

গ্রন্থপঞ্জী

Banerjee, A.C. — *Aspects of Buddhist Culture from Tibetan Sources.* Firma KLM Private Ltd. Calcutta. 1984.

Basant, L.B. — *Sikkim—A Short Political History* New Delhi. 1974.

Bell, Sir Charles — a) *The Religion of Tibet,* Oxford. 1931, Reprint 1968.
b) *The People of Tibet,* Oxford. 1928, Reprint 1968.
c) *Tibet—Past & Present,* Oxford. 1924, Reprint 1968.

Blofeld, John — *The Way of Power*—London. 1970

Chatterjee, Suniti Kumar — *Kirate Janakriti.* Asiatic Society of Bengal, Calcutta. 1951.

Chopra, P.N. — *Sikkim,* New Delhi. 1979.

Combe, G.A. — *A Tibetan on Tibet.* Bib : Hima : Nepal. 1975.

Dahdul, Yapa D. — *The Hidden Land of Rice* (manuscript).

Das, Sarat Chandra — a) *Journey to Lhasa and Central Tibet.* Manjushri, New Delhi. 1970.
b) *Indian Pandits in the Land of the Snow.* Firma KLM, Calcutta. 1965.

Das, B.S. — *The Sikkim Saga.* Vikash, New Delhi. 1983.

Deb, Arabinda — *India and Bhutan* (A Study in Frontier Political Relations : 1772–1865) Calcutta. 1976.

Donaldson, Florence — *Lepcha Land and Six Weeks in Sikkim.* London. 1900.

George, Kotturam — a) *Folk Tales of Sikkim,* New Delhi. 1976.

b) *The Himalayan Gateway.*
Sterling, New Delhi. 1970.

Gorer, Geoffrey — *The Lepchas of Sikkim.*
Cultural Publishing House, New Delhi. 1984.

Goyal, Narendra — *Political History of Himalayan States*
New Delhi. 1966.

Grover, B.S.K. — *Sikkim and India--Storm and Consolidation.*
New Delhi. 1974.

Hermanns Fr. Matthias — *The Indo-Tibetans*
Reprint, Bombay. 1954.

Hodgson Brian, H. — *Essays on the Languages, Literature and Religion of Nepal and Tibet.*
Bib : Hima : Nepal. 1972.

Hooker, Sir John — *Himalayan Journal Vol. I-II.* London. 1882.

Kawaguchi, Ekai — *Three Years in Tibet*
Bibliotheka Himalayica (Nepal). 1979.

Ling, Trevor — *The Budha--The Story of a Civilization.*
Penguin, London. 1973.

Macaulay, Colmon — *Report of a Mission to Sikkim and the Tibetan Frontier, 1884.*
Bib : Hima : Nepal. 1977.

Maharaja Tuhtob Namgyal and Maharani Yeshey Dolma — *A History of Sikkim* (manuscript).

Rustomji, Nari. K. — *Enchanted Frontiers.* Oxford University Press, Calcutta. 1973.

Salisbury, C.Y. — *Sikkim-The Mountain Kingdom.*
Reprint. New Delhi. 1972.

Sanyal, Charu Chandra — *The Limbus.* Calcutta. 1979.

Singh, A.K. — *Politics of Sikkim-A Sociological Study.*
New Delhi. 1975.

Sinha, Nirmal C. — *An Introduction to the History and Religion of Tibet.* Calcutta. 1975.

Snellgrove, David — *Buddhist Himalaya.* Oxford. 1957.

Stocks C. De. Beauvoir — *Sikkim—Customs and Folklore.*
Cosme Publication, Delhi-1977.

Sukla, S.R. — *Sikkim—The Story of Integration.*
New Delhi. 1976.

Taleyarkhan, Homi J.H. — *Splendour of Sikkim*. Govt. of Sikkim. 1981.

Temple, Sir Richard — *Travels in Nepal and Sikkim*.
Bibliotheka Himalayaica, (Nepal). 1977.

Tucci, Giuseppe (Translated by J.E. Stapleton Driver) — *Tibet—Land of Snow*. Oxford. 1967.

Waddel, L. Austine — *Buddhism and Lamaism of Tibet*.
Heritage Publishers, New Delhi. Reprint 1979.

White, J.C. — *Sikkim and Bhutan—Twenty one Years on the North East Frontier*.
Vivek Publishing House, New Delhi. 1971.

পাঠক, সুনীতি — তিব্বত
ভারতী বুক ষ্টল, কলকাতা, 1960.

ভিক্ষু অনোমদর্শী ও মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক — ধম্মপদং প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী, কলকাতা।

সংকৃত্যায়ন, রাহুল — তিব্বতে সওয়া বৎসর
অনুবাদ : মলয় চট্টোপাধ্যায়, চিরায়ত, কলকাতা।

সাময়িকী, প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও সরকারী দলিল

"A few facts about Sikkim" (Pamphlet) December-1947. —Tashi Tshering

"Democracy in Sikkim" (in *NOW*-Vol.2, Calcutta. April 29, 1966)— L. B. Basant.

"Buddhism and Social Action" (Pamphlet). The Wheel Publication, Sri Lanka, 1981. —Ken Jones.

"Buddhism in India—Light of Buddhism in Sikkim". N-1. Vol-4. 1982, Journal of the Asian Buddhist Conference for Peace, 1982. —P. B. Chakraborty.

"Sikkim and Himalayan Trade" Bulletin of Tibetology No. 3-1981. —Prof. Jahar Sen.

"Buddhism—its impact on Tibetan Life and Culture". Aspects of Buddhism—Silver Jubilee Commemorative Volume of the Sikkim Research Institute of Tibetology and other Buddhist Studies. 1981. —Dr. Anukul Banerjee.

"Nepal—The Cultural Heritage of India Vol. V". The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta. 1978. —Dr. Paras Mani Pradhan.

"Tibet, Mongolia, and Siberia" The Cultural Heritage of India Vol. V. The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta. 1978.
—Suniti Kumar Pathak.

"Srijnana Dipankar Atisa (C 980-1054)" Sikkim Research Institute of Tibetology, Gangtok. 1967. (Pamphlet) —Dr. Nirmal C. Sinha.

"Laws of Sikkim—Orders of the former Rulers." Journal of the Bar Council of India, Vol. VIII (2) 1981. —Justice A.M. Bhattacharjee

"Losson in Sikkim". Sikkim Herald—Information Service of Sikkim, January 6, 1982. —K. Nima

"Lepchas of Sikkim". Bulletin of Tibetology. No. 2-1982. Gangtok.—Nita Nirash

The Gazetteer of Sikkim, 1894. Reprint New Delhi. 1973.

Bengal District Gazetteer—Darjeeling. Bengal Govt. Press. Calcutta, 1947.

Bengal District Gazetteer—Darjeeling. The Bengal Secretariat Book Deptt. Calcutta. 1907.

States of our Union—Sikkim—Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India. 1980.

India—A Reference Annual, 1983. Ministry of Information and Broadcasting Division, Govt. of India.

Sikkim-The Land and its People. Sikkim Govt. Press, Gangtok.

Administration Report of the Sikkim State for the Year 1930-31, 1933-34, 1934-35, 1935-36.

Memorandum of the Government of Sikkim—Claims in respect of Darjeeling. Revenue Order No. 1 1917 & 1956.

Sikkim Subjects Regulation, 1961.

Sikkim Darbar Gazette—March, 1953. Proclamation of His Highness Maharaja Tashi Namgyal.

Sikkim Darbar Gazette—August, 1956.

Sikkim Darbar Gazette—December, 1966.

Sikkim Darbar Gazette—December, 1969.

Press Note of the Ministry of External Affairs, 20th March, 1950.

The Constitution of India—Article 371 F.

The Constitution (Thirty-Sixth Amendment) Bill, 1974.

The Constitution (Thirty-Eighth Amendment) Bill, 1975.

Census of India, 1981 (Sikkim).

Parishad Government—An Outline of its Achievements, Government of Sikkim, March, 1979.

Treaty of Titalia, 1817.

Treaty of Tumlong, 1861 (Treaty, Convenant or Agreement between the British Govt. and Maharaja, of Sikkim).

Convention between Great Britain and China relating to Sikkim and Tibet, 1890.

Regulation Regarding Trade, Communication and Pasturage to be appended to the Convention of 1890.

Indo-Sikkim Treaty, 1950.

Indo-Sikkim Agreement, 1973.

Government of Sikkim Act, 1974.

□

নির্ঘণ্ট

□□

বিউটি প্রিন্ট, পাহাড়গঞ্জ, নয়াদিল্লি-110055 থেকে মুদ্রিত।